স মা জ প র্ব

সমাজ পর্ব

প্রথম অধ্যায়

সমাজ জীবনে আদর্শের রূপান্তর ও শ্রীমদ্ভাগবদগীতা।

।। প্রাক্ কথন ।।

মানুষ লইয়াই সমাজ। মানুষই সমাজের উপাদান। আবার সমাজের সংগঠন, সংরক্ষণ, সংগঠনাদি বিষয়ের মূল নিয়ামকও মানুষ। সমাজ সমূহের মধ্যে মানুষ যেন একাধারে উপাদান ও নিমিত্তকারণ। রাষ্ট্রচেতনা, শ্রেণী-বিন্যাস, শিক্ষাব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অর্থনৈতিক অবস্থা, নৈতিক বিচার ধর্মীয় বিশ্বাস প্রমুখ যাবতীয় সামাজিক বিকাশ ও ক্রিয়াকর্ম যাহাকিছু সবই কেবল মানুষের জন্য এবং মানুষ দ্বারা অনুষ্ঠিত একদিকে যেমন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাদি কামনার সংঘাতে সমাজের পরিবেশ পরিবর্ধিত হয়। আবার অন্য দিকে রূপান্তরিত পরিবেশের প্রভাবে মানুষের মনে নানা পরিবর্তন আনে। ভিতরের ও বাহিরের মিলন জনিত বা বিরোধ জাত নানা সংঘাতের ফলে পরিবর্ধমান পরিবেশের চাপ – নূতন নূতন চেতনায় ও কর্মে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। উপস্থাপিত অবস্থার (Thesis) সংগে নূতন আগত অবস্থার (Anti Thesis) বিরোধ সংঘর্ষ ঘটায় তারপর দুইটিতে মিলিয়া একটি সমন্বিত অবস্থার (Synthesis) উদ্ভব হয়। হেগেলীয় এই দ্বান্দ্বিক সূত্রের অনুসারে মানব সমাজের রূপান্তরের পথটি এখন সর্বস্বীকৃত।

সর্বদেশ ও সমাজের মত বাংলা তথা ভারতীয় সমাজেও

এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুদূর অতীত কাল হইতে এই পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে ইংরাজ রাজ শক্তির উদ্ভবের পর – বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ইয়োরোপের সহিত – বাঙালীর তথা ভারতের সংযোগ সংস্পর্শে যে মিলন সংঘটিত করিল তাহাতে আবির্ভাব হইল নবযুগের। ঊনবিংশ শতকে এই নব যুগ চেতনা একটি বিশেষ আন্দোলনের তরংগে মুখ্যতঃ বংগ দেশ ও বাঙালী জাতিকে কেন্দ্র করিয়া এসে গোটা ভারতকে প্লাবিত করিল। এই নবযুগের প্রাণ শক্তিটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জীবন ধারার চিরাগত রূপেরই নব বিগ্রহ, যাহাকে কবি বলিয়াছেন " বিশ্বিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"। সকল বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য – বিরোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এই প্রসংগে ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মন্তব্যটি উদ্ধার করি।

" আজিকের ভারতবর্ষ হিন্দু সমাজ ও ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতি দৃষ্টিগোচর তাহার ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায়, এই সমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন স্তরের প্রাক্ আর্য ও অনার্য, কিছু কিছু বৈদেশিক নরগোষ্ঠীয় সমাজ ও ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস বা আত্মসাৎ করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে আজও তাহার বিরাম নাই। যে প্রাক্ আর্য বা অনার্য যে কোন সভ্যতা বা সংস্কৃতি স্তরে সেই অনুযায়ী বৃহত্তর হিন্দু সমাজে তাহার স্থান নির্নীত হইয়াছে এবং নানা বিধি বিধান দ্বারা সেই স্থানটিকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সজ্ঞানে সচেতন ভাবে পারিপার্শ্বিকের সুযোগ সুবিধা লইয়া সেইসব বিধি বিধানকে অগ্রাহ্য করিয়া বৃহত্তর সমাজে স্থান লইতে পারিয়াছে তাহারা এক্ষণঃ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতেও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর তাহার সুযোগ সুবিধা খুব বেশী ছিল না, বিধি বিধানের প্রাচীর ছিল সুদৃঢ়। তাহার ফলে বৃহৎ হিন্দু সমাজ ও ধর্মের সভ্যতা

সংস্কৃতির ভিতর নানা স্তর, নানা আকৃতি প্রকৃতি নানা রূপ, নানা বৈচিত্র্য, কিন্তু সব কিছুই একটা বৃহত্তর সীমার মধ্যে একীকৃত ও বহুলাংশে সমন্বিত।"[১]

বাংলা দেশ ও সমাজ সম্বন্ধেও মোটামুটি একই কথা বলা চলে।

প্রত্যেক বিরোধ এবং তাহার সমাধান আসে দুইটি দিক হইতে। একটি তাৎকালিক অপরটি নিত্যকালীন বা সনাতন। কোন বিরোধের সমাধান কল্পে আমাদের এই দুইটি দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গীতায় যাহাকে বলা হইয়াছে দৈবী সম্পদ বা সত্ত্বগুণ (অভয়, চিত্তশুদ্ধি দান, দম, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য সত্য, অক্রোধ, দয়া, ক্ষমা, পবিত্রতা) তাহাকেই মানবের নিত্যধর্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়। কারণ মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহা মুখ্যতঃ উক্ত গুণগুলির সমন্বিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সকল গুণরাজি সকল মানব সমাজে সকল দেশের সকল কালের মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। এই প্রকার শ্রেষ্ঠ গুণ সকল লাভ করিবার জন্য প্রতিদেশে ব্যষ্টি বা সমষ্টি মানুষ নিয়ত যত্নশীল। যে সমাজ এই গুণগুলিতে বর্তমান প্রতিষ্ঠিত সেই সেই সমাজ তত বেশী সভ্য ও সমুন্নত।

বাঙালীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব উনবিংশ শতাব্দিতে বাঙালীর জীবনে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্নক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে গুরুতর পরিবর্তন আসিয়াছিল। এই সমসাময়িক নবজাগরণের পটভূমি কি? এই প্রসংগেঅনুসন্ধান কার্য চালাইলে সহজেই একটি বিস্ময়কর দৃশ্য চোখে পড়ে তাহা এই যে সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বড় বড় দিকপালের আবির্ভাব। তাঁহাদের জীবন ছিল উক্ত দৈবী সম্পদে সমৃদ্ধ, কর্ম ছিল নিষ্কাম-কর্মের অনুপ্রেরণায় অনুরঞ্জিত এবং হৃদয় ছিল ভগবৎ প্রেমধারায় অভিসিঞ্চিত।

এই সময়কার সমাজ জীবনের ধারায় সেবামূলক নিষ্কামকর্মের প্রচার ও প্রভাব দর্শন করিবার পূর্বে, তৎপূর্ববর্তী সময়কার অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর জাতীয় জীবনের অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ইহার বর্ননা আনন্দ মঠে বংকিম চন্দ্র বলিয়াছেন এইভাবে :

বাঙালীর জাতীয় জীবন তখন - "ঘন অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন।"[২]

"১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশে ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। তখন টাকা লইবার ভার ইংরাজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ভার পাপিষ্ঠ মিরজাফরের উপর। মিরজাফর খুলি খায় আর ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লিখে, বাঙালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"[৩]

এদিকে ব্রিটীশ সরকারের জনকল্যান মূলক কর্মের প্রতি উদাসীনতা অপরদিকে মিরজাফরের অলসতা। এই দুইটি কারণে জাতি উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছিল।

ইহার কারণ সুস্পষ্ট। রাজশক্তি ও সুশাসন অপদার্থ দুর্বল অসাধু হইলে জনকল্যান কখনো সম্ভব হয় না। ভারতীয় ধারণায় রাজা ঈশ্বরের প্রতিভূ। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন যে মনুষ্যকুলের মধ্যে তিনি রাজা।[৪] যদি রাজকীয় গুণরাশি রাজার মধ্যে না দেখা যায়, তবে তাহাকে নর শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না। আবার রাজার আচরণ যথাযথ না হইলে তদধীন কর্মচারী ও প্রজাবর্গের

আচরণ যথাযথ হইবে, ভাল হইবে এমন আশা করা যায় না। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই অনুকরণশীল। শ্রেষ্ঠ জনেরা যাহা করেন অন্যান্য মানুষও তাহারই অনুকরণ করে। সুতরাং ধর্মজ্ঞানহীন অসাধু রাজার রাজত্বে অরাজকতা হওয়াই স্বাভাবিক।

ইহার পর কিভাবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে সুবে বাংলার রাজশক্তি অধিকার করিল, কি ভাবে "বণিকের মানদণ্ড দেখাদিল পোহালে শর্বরী রাজ দণ্ড রূপে" - তাহার ইতিহাস সুবিদিত। এই তাৎকালিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সংগে সংগে কেবল যে প্রশাসনে পরিবর্তন আনিল তাহা নহে, অর্থ-নৈতিক জীবনে, সমাজ ব্যবস্থায় এবং শিক্ষানীতির মধ্যে প্রভূত রূপান্তর সংঘটিত করিল। প্রচণ্ড ভূকম্পনের ফলে যেমন জরাজীর্ণ প্রাসাদ ও কুটির বিধ্বস্ত হইয়া যায় প্রাচীন মহীরুহ উৎপাটিত হয় সরোবর বিশুষ্ক হইয়া যায় পর্বত ভূগর্ভে নিম-জ্জিত হয় - ভূপ্রকৃতির আকস্মিক বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেকটা তেমনি মুসলমান রাজত্বের অবসানে ও বৃটিশ রাজশক্তির আকস্মিক অভ্যুত্থানে বাঙালী সমাজ প্রচণ্ড প্রকম্পনে দিশাহারা হইয়া পড়িল। নূতন জমিদারী ব্যবস্থা, কর-ব্যবস্থা, নূতন ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্ভব নূতন শিল্প পদ্ধতি সব কিছু লইয়া বাঙালীতথা ভারতীয় জীবনে এক নব যুগের সুপ্রভাতের সূচনা হইল। তাৎকালীন পরিবর্তনের নূতন ক্ষেত্রে নিত্যকালীন সনাতন ভারতের চিরনুন প্রাণশক্তি বীজ থেকে অংকুরিত হইল বিশাল বিশাল বনস্পতি। নব জাগরণের বাণী মন্ত্র কণ্ঠে লইয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বের শক্তি লইয়া একই কালে অষ্টাদশ শতকের অন্যুপাদ হইতে ঊন-

বিংশ শতকে আবির্ভূত হইলেন বংগদেশে একদল মণীষা। বিরল প্রতিভার অধিকারী এই নবোদিত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর কর্মজ্যোতিতে ও চরিত্র প্রভায় বহুদিনের পুঞ্জিত অন্ধকার যেন মুহূর্তে বিদূরিত হইল। আসিল আধুনিক বাংলা তথা ভারতের নবযুগ।

এই অংশে অর্থাৎ সমাজ পর্বের আলোচনায় এই যুগের প্রগতির মুখ্য ধারাগুলিকে কয়েকটি বিশেষ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব। সমকালীন সাময়িক ও মুখপাত্র প্রতিক্রিয়ার বিরোধ ও সংঘর্ষ এড়াইয়া, যথাসম্ভব কম স্থান দিয়া মুখ্য ধারাকে অনুসরণ করিব। বলা বাহুল্য যে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার প্রেরণা ও ভাবধারা কি ভাবে কাজ করিয়াছে তাহার অনুসন্ধানই এই নিবন্ধের নির্দিষ্ট বিষয় বলিয়া যে সব ক্ষেত্রে তাহা পরিস্ফুট কেবল তাহার দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবে।

ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনে কর্মধারা

প্রতি জাতি ও সমাজের যথার্থ পরিচয়টি জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং বাঙালী সমাজ জীবনের যথার্থ স্বরূপও বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যেই অনুসন্ধান যোগ্য। বাঙালী সমাজ জীবনের প্রকাশ শিল্পিত প্রকাশ বাঙালী মানস-সংস্কৃতিতে। বাঙালী সংস্কৃতির পরিচয় তাহাদের ধর্ম জিজ্ঞাসায়সমসাময়িক শিল্প সাহিত্যে জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনায় ও বহুমুখী শিক্ষাপ্রকল্পে। ইহাকে সম্যক বুঝিতে হইলে উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশদ পর্যালোচনা আবশ্যক।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনভার গ্রহণ করিবার পর পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রবলতর হইল। ইংরাজী শিক্ষা প্রসারিত হইল - সংস্কৃতি শিক্ষাদিও ক্রমশঃ ইংরাজী শিক্ষা ধারার সহিত সমন্বিত হইল। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহের প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ক আন্দোলন বলবত্তর হইল। কোন কোন ক্ষেত্রে আইন-ও বিধিবদ্ধ হইল। ইংরাজী সভ্যতার প্রভাবে কিছু তরুণ খ্রীষ্টান-ধর্ম গ্রহণ করিলেন। শিক্ষার মধ্যে যে মানস মুক্তি আছে তাহা আত্ম সংশোধনে নিয়োজিত না হইয়া ভাবানুকরণের মধ্যে উৎসর্জিত হইল। অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার উজ্জ্বল রূপে আকৃষ্ট হইয়া বহির্মুখ পতংগের মত ইয়ং বেংগল সম্মুখে ছুটিলেন। প্রাচীন সভ্যতার মূল্য বোধের মূলে যে কালিমা পুঞ্জিত হইয়াছিল তাহা দেখিবার অবকাশ হইল না। ভারতীয় জীবনের সে অন্ধকার আবর্জনা তাহা দূর

করিবার চেষ্টা হইল না। দেশ, ধর্ম, জাতি সম্বন্ধে একটা কুৎসিত হীন-ধারণার উদ্ভব হইল। বিজাতীয় জীবন ভংগী ও খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে মুক্তির ত্রাণপথ খুঁজিতে লাগিলেন তখনকার একদল শিক্ষিত তরুণ। তখন বিভ্রান্তির ঘন তমসাচ্ছন্ন পথে যে কয়েক জন মণীষী অগ্রসর হইলেন জ্ঞানের আলোক বর্তিকা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ যোগ্য রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪ - ১৮৩৩) নাম - রবীন্দ্র নাথ যাঁহাকে বলিয়াছেন 'ভারত পথিক'।

রামমোহন ভারতের বেদান্ত উপনিষদ প্রতিপাদ্য ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়া ছিলেন। তাহাতে হিন্দু-ধর্মের মূর্তিপূজাদি ও তদানুষংগিক ভক্তি স্থান অস্বীকৃত হইয়াছিল। তিনি একেশ্বর বাদের এবং তার মধ্যেও অদ্বৈততত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পরে উপনিষদের প্রকাশ ও প্রচার ব্যাপকভাবে তিনিই শুরু করেন এবং তন্ত্রের দার্শনিক দিক সম্বন্ধেও তিনি শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ফলে তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষিত যুবক সমাজ রামমোহনের প্রবর্তিত উপাসনা পদ্ধতি যাহা পরে ব্রাহ্ম ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছিল - তাহার দিকে আকৃষ্ট হন। যাহারা ছিলেন হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন এবং পাশ্চাত্য ধর্মে আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাবান তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। এইরূপ না হইলে অর্থাৎ রামমোহনের আবির্ভাব না হইলে কেবল যে একদল তরুণ

হিন্দু ধর্ম ছাড়িয়া খ্রীস্টান হইয়া যাইতেন তাহাই নহে – ভারতীয় অধ্যাত্ম্য সাধনার এক উজ্জ্বল রত্ন – ব্রহ্মবাদ – অজ্ঞানতার মৃত্তিকার অন্তরালে চাপা পড়িয়া থাকিত, কত দিন কে জানে?

রামমোহনের পর ব্রাহ্ম ধর্মের নেতৃত্ব আসিল দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের (১৮১৭ –১৯০৫) হাতে। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন প্রথমে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই দেবেন্দ্র নাথের সহিত কেশব চন্দ্রের মতভেদ হইল। কেশব চন্দ্র আলাদা হইয়া নূতন সমাজ গঠন করিলেন। দেবেন্দ্র নাথের প্রতিষ্ঠানের নাম হইল আদি ব্রাহ্ম সমাজ আর কেশব চন্দ্রের প্রতিষ্ঠানের নাম হইল নব বিধান সমাজ।

নববিধান সমাজের বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে লক্ষনীয় প্রকাশ ধর্ম জীবনের সংগে সামাজিক জীবনের সমন্বয় সাধন, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য বিধান, ঈশ্বরে আত্ম সমর্পন মূলক সমাজ সেবায় আত্ম নিবেদনের প্রচেষ্টা। প্রমুখ নানা প্রয়াস। এই বহুমুখী কর্ম ধারার মূলে যে গীতার সমন্বয় মুখী আদর্শটি উৎসরূপে বিদ্যমান – তাহা একটু অবহিত হইলেই জ্ঞানগোচর হয়। যাহা-হউক নববিধান সমাজের বিশেষত্ব প্রসংগে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক উপস্থাপিত দৃষ্টান্ত সমূহ সিদ্ধান্তরূপে উদ্ধার যোগ্য :

"দেবেন্দ্রনাথ মানবের সামাজিক জীবনকে ধর্ম সাধনের অংগীভূত করেন নাই, কিন্তু কেশবচন্দ্র আধ্যাত্মিক অর্চনার ন্যায় মানবের সামাজিক

জীবনকে ধর্মসাধনের অংগীভূত করিলেন। জাতিভেদ বর্জন, নারীগণের শিক্ষা ও সর্ববিধ উন্নতি বাল্যবিবাহ নিবারণ, পানদোষ বর্জন – প্রভৃতির দিকে যুবক ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

দেবেন দ্রনাথ ব্রাহ্মদিগকে হিন দ্রভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রণ্থ সকলের সমালোচনাই প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেশবচন দ্র খৃস্টীয় শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ব্রাহ্ম ধর্মকে এক উদার আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহাধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে করেন।

রামমোহন ও দেবেন দ্র নাথের ধর্ম বহুল পরিমানে জ্ঞানের ধর্ম ছিল। রামমোহনের জ্ঞানপ্রধান বেদানুবাদ এবং দেবেন দ্রনাথের ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্ম ধ্যান ওব্রহ্মানন দ্র রসপান ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান উপজীব্য ছিল। কেশবচন দ্র বৈষ্ণ বীয় কীর্ত্তন প্রথার প্রবর্ত্তন ও চৈতন্য প্রভৃতি ভক্তগণের জীবন আলোচনা করিয়া এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের ভক্তি স্রোতের প্রবাহ বহিতে থাকে। ইহা দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্মকে জ্ঞানপ্রধান বেদানুবাদে পরিণত হওয়ার বিপদ হইতে রক্ষা এবং ব্রাহ্ম ধর্মেরসাধনে জ্ঞান ও ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কেশবচন দ্র ব্রাহ্ম সমাজের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

ঈশ্বরের করুণাতে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্ম সমাজের সেবাতে দেহ মন প্রাণ নিয়োগ করিতে পারেন এরূপ এক প্রচারক দল সৃষ্টি করা কেশব চন দ্রের একটি প্রধান কার্য।"[৬]

কেশবচন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের বিবাহ ও অন্যান্য কারণে তাঁহার দলের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দিল। ফলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নাম গ্রহণ করিয়া শিবনাথশাস্ত্রী আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ তরুণগণ আলাদা হইয়া গেলেন। ব্রাহ্ম সমাজ- আদি, নববিধান, সাধারণ এই তিন ধারায় বিভক্ত হইয়া গেল।

সামাজিক ক্রিয়া কর্মে, উপাসনা পদ্ধতিতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও, এই ব্রাহ্ম সমাজ তিনটির মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মের মূলতত্ত্ব নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ব্যাপারে কোন পার্থক্য ছিল না। ক্ষেত্র বিশেষে ভক্তির ও সমাজ সেবার প্রাবল্য অবশ্য দেখা দিয়াছিল।

নববিধানে ব্রহ্মকে মাতৃরূপেও বন্দনা আরাধনা চলে। ইহা অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত কেশবচন্দ্রের মিলনের ফল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখ্য কর্ম প্রসারিত হইল সমাজ সেবামূলক শিক্ষাবিস্তারে ও নানা উন্নয়নমূলক কাজে। এই আনদোলনে সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে যে কর্মপ্রেরণা, সমাজহিতৈষণা জ্ঞান পিপাসা, ঈশ্বরভক্তি দেখা দিয়াছিল - তাহাতে শুধু ব্রাহ্ম সমাজের তিনটি শাখাই নহে -শিক্ষিত হিন্দু বা সনাতন ধর্মী তরুণ দল বিপুলভাবে যোগদান করিয়া ছিলেন। এইসব ক্ষেত্রে ও এক সমন্বয়মুখী জীবনানুশীলনে নিষ্কামকর্মো-দ্দীপনার মধ্যে সচেতন বা অচেতন যে ভাবেই হউক গীতার ভক্তি বর্জিত জ্ঞান কর্মসমুচ্চয়বাদকে মূল প্রেরণারূপে তুলিয়া ধরা যায় কি?

ব্রাহ্ম ধর্মের নিরাকার সাধন জীবন হইতে কয়েকজন হিন্দু ধর্মের সাকার সাধনার দিকে ফিরিয়া আসিলেন। নরেন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আশ্রয় লাভ করিয়া ছিলেন। তাহার পর আসিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্য-

তারাকিশোর চৌধুরী।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপবীত ত্যাগ করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন। কিন্তু সমাজের কর্মধারা ও ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি তাঁহার গভীর অধ্যাত্ম্য ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাহচর্যে তিনি বিগ্রহ পূজার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া হিন্দু মতে পূজা অর্চনার সার্থকতা উপলব্ধি করিলেন।

এইসব কারণে নববিধানের সহিত মতের অমিল হইল এবং ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়িয়া তিনি পঞ্জাব আকাশগঙ্গা পাহাড়ে সিদ্ধ পরমহংসের নিকট পুনর্বার উপবীতাদি গ্রহণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং কালে সিদ্ধিলাভ করিয়া অধ্যাত্ম্য জগতে অন্যতর জ্যোতিষ্ক রূপে পরিগণিত হন। গীতোক্ত শরণাগতি ক্রিয়া যোগ ও মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম সমন্বিত করিয়া কালোচিত একটি সাধনপ্রনালী নিজে উপলব্ধি করিয়া তাহা প্রচার করেন। বহুলোক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। এই প্রসংগে ইহাও স্মরণীয় যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অদ্বৈত বংশ জাত। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব রক্ত ধারা তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত। তাই বৈষ্ণব সাধনার যমুনা ধারার সংগে তিনি গীতোক্ত যোগসাধনের গংগাধারার মিলন করিতে পারিয়াছিলেন। গোস্বামীজী নিজে গীতার কোনো ভাষ্য রচনা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবন সাধনার ও উপদেশাবলীর মর্মমূলে গীতার বাণী – 'মামেকং শরণং ব্রজ' নিয়ত অনুরণিত হইতেছে।

শ্রীহট্ট জেলার তারাকিশোর নামজাদা উকিল ছিলেন। তিনিও উপবীত

ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। এবং ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন কালক্রমে তাঁহার মনে নানা অনুর্দ্বন্দ্ব উঠিল এবং নানা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন তিনি। উত্তরকালে তারাকিশোর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য রামদাস কাঠিয়াবাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস জীবনে তাঁহার নাম হইয়াছিল সন্তদাস বাবাজী। সনাতন ধর্মে প্রতিটি সম্প্রদায় স্বীয় মতানুসারে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ সন্তদাস বাবাজী গীতার একটি বংগানুবাদ করিয়াছেন।"

ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠায়, প্রচারে ও ব্রাহ্মোপাসনায় গীতার স্থান [illegible] সমুচ্চে প্রতিষ্ঠিত। রামমোহন তাঁহার মত প্রতিষ্ঠায় উপনিষদ ও গীতার মন্ত্র এবং শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ হিসাবে অজস্র গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিজে গীতা অনুবাদ করিয়াছিলেন। সাহিত্য সাধক চরিতমালায় রামমোহন রায়ের রচনাবলীর পরিচয় প্রসংগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখ যোগ্য। "রামমোহন ভগবদগীতা পদ্যে অনুবাদ করিয়া ছিলেন বলিয়া জানা জায়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে [illegible] রাজেন্দ্র মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে সমালোচনা প্রসংগে লিখিয়াছিলেন – 'বোধ হয় শ্রীযুত রাজারামমোহন রায় কর্তৃক ভগবদ্গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙালী পদ্য গ্রন্থে তদ্রূপ হয় নাই। (বিবিধার্থ সংগ্রহ, আষাঢ়, ১৭৮০ শক, পৃঃ ৭২)। .... আমরা রামমোহনকৃত গীতার অনুবাদ দেখি নাই। তবে ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ দেখিয়াছি; বৈকুণ্ঠনাথ রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার নির্বাহক ছিলেন। কোন পণ্ডিতের

সহকারীবলম্বনে তিনি ভাগবদ্ গীতা অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ রামমোহন রায়ের বেনামী রচনা কিনা বলিবার উপায় নাই।"[৭]

ঠাকুর পরিবারেও গীতার প্রভূত সমাদর ছিল। দেবেন্দ্র নাথ নিজে গীতার কয়েকটি নির্বাচিত শ্লোক সংকলন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্র নাথ জীবন স্মৃতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"ভগবদ্ গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেগুলি বাঙলা অনুবাদ সমেত আমাকে কপি করিতে দিয়াছিলেন।"[৮]

দ্বিজেন্দ্র নাথ রচনা করিয়াছিলেন গীতাপাঠ। তত্ত্ববোধিনী ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩২২ সালে। ভূমিকাতে তিনি লিখিয়াছেন :

"আমার কুটীরে কুটীরে বিনা তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে - ভগবদ্ গীতা। ********পশ্চিমের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যত না আলোকছটা দিগ্ দিগন্তরে বিস্তার করিতেছে - আমাদের ক্ষুদ্রদীপের শিখা তাহা সমস্তের উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছে।"[৯]

সত্যেন্দ্রনাথ গীতার একখানি পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন - ১৩১১ সালে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন লোকমান্য তিলকের ভাষ্য ও গীতা-রহস্যের বংগানুবাদ। রবীন্দ্রনাথের গীতা সম্বন্ধে সুতন্ত্র কোন রচনা না থাকিলেও রবীন্দ্র সাহিত্য ও জীবনে গীতার সমুন্নত ভাবধারা অন্যতর উৎস হিসাবে কাজ করিয়াছে। আমরা প্রসংগান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ব্রাহ্ম সমাজের গীতা আলোচনার প্রসংগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নববিধান সমাজের উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের নাম। তিনি গীতা প্রপূর্তি নামে একটি অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবদবলম্বনে গীতার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মোটকথা ঊনবিংশ শতকের অন্যতম বলিষ্ঠ ধর্মীয় ও সামাজিক যে আন্দোলন ব্রাহ্ম ধর্মকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল - তাহার আদর্শ প্রতিষ্ঠা উপাসনাপদ্ধতির বিন্যাস, সমাজ সংস্কার প্রয়াস, শিক্ষা বিস্তার ও সাহিত্য সৃষ্টি - সর্বক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবদ গীতার দান ও প্রভাব অফুরন্ত। সুতরাং বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়া ও ইহা বুঝিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না যে, ত্রিধা বিভক্ত ব্রাহ্ম সমাজের ধ্যান-ধারণা এবং বিচিত্র কল্প ও বহুমুখী কর্ম-ধারার মূলে গীতার নিষ্কাম কর্ম ও সেবার আদর্শ এবং শরণাগতির দিকটি সক্রিয় প্রেরণা রূপে ক্রিয়াশীল ছিল।

॥ বঙ্কিম চন্দ্রের সমাজচিন্তা ॥

ত্রিধা বিভক্ত ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি বহুমুখী প্রতিভা লইয়া সনাতন ভারতীয় আদর্শের পুনর্বিচারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮ – ১৮৯৪)। বঙ্কিম চন্দ্রের বহুমুখী অবদানের মধ্যে কোনটি প্রধানতম এই সম্বন্ধে একজন সমালোচকের উক্তি উল্লেখ করা যাউক –

"সাহিত্যের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র জড়ত্বাবিষ্ট জাতির নিকট প্রমাণ করিয়াছেন জড়ত্ব অভিশাপ –কর্মেই মানুষের মহত্ব। আর সংগে সংগে তিনি বুঝাইয়াছেন কর্মের মধ্যে নিষ্কাম কর্মই শ্রেষ্ঠ।"[১০]

"মণীষী অরবিন্দ বলিয়াছেন জাতির জন্য বঙ্কিম চন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য তিনি আমাদিগকে মাতৃমূর্তি দিয়াছেন।"

"মাতৃভূমি যতক্ষণ আমাদিগের মানসনেত্রে ভূমিখণ্ড বা লোক-সমষ্টি ব্যতীত অন্যরূপে প্রতিভাত না হয়েন –যতক্ষণ তিনি স্বর্গীয় মাতৃত্বে, শক্তিতে, অনন্ত সৌন্দর্যে আমাদিগের চিত্ত অধিকার না করেন, ততক্ষণ জননীর জন্য জননীর সেবায় সকল ক্ষুদ্র ভয় ও আশা দূর হইয়া যায় না –ততক্ষণ যে দেশপ্রেম অসাধ্য সাধন করে ও অভিশপ্ত জাতির উদ্ধার সাধন করে, সে দেশ প্রেম উদ্ভূত হয় না। বঙ্কিম চন্দ্র মাকে সেইরূপে দেখিয়াছিলেন ও দেশবাসীকে দেখাইয়াছিলেন। সমগ্র জাতি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল।"[১১]

বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ স্বদেশপ্রেমকেই অন্যতম ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। "সকল ~~ধর্মের~~ ধর্মের উপর স্বদেশ প্রীতি ইহা বিস্মৃত হইও না।"[১২] মৃন্ময়ী জননীকে চিন্ময়ীরূপে দর্শন করিতে শিখাইয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

তাঁহার রচিত 'বন্দেমাতরম্' শব্দটি ভারতের স্বাধীনতা সাধনায় মন্ত্ররূপে কাজ করিয়াছে। বন্দেমাতরম্ সংগীতটি ছিল তখনকার দিনে দেশ-মাতৃকার শ্রেষ্ঠ বন্দনাস্তুতি। ~~আজ~~ আজও বন্দেমাতরম্ সংগীতের প্রথম স্তবকটি স্বাধীন ভারতের বিকল্প জাতীয় সংগীত।

বঙ্কিম প্রতিভার মূল্যায়নে অপর একজন মণীষীর মন্তব্য উদ্ধার করি -

"বস্তুত একটু অনুসন্ধান করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, রাম-মোহন রায়ের ও বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মান্দোলনের মধ্যে প্রণালীর কোন বিশেষ প্রভেদ ছিল না। উভয়েই প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কারকে অন্ধভাবে মানিয়া না লইয়াই যুক্তি তর্কের সাহায্যে তাহার সত্যতা নিরূপণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু দুই জনের সিদ্ধান্ত ছিল একেবারে বিপরীত। রামমোহন একেবারে বেদ বেদান্তকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং পরবর্তীকালে যে পৌরাণিক ধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা অসার বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিপন্ন করিলেন যে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম বর্জনীয় নহে তাহার মধ্যেও হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ আছে। দুই জনেই বহু কুসংস্কার ও কদাচার বিসর্জন করিয়া বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম কি তাহার নিরূপণে যত্নবান

হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কলুষতাবর্জিত সত্য হিন্দু ধর্ম কি সে সম্বন্ধে তাঁহারা বিপরীত মত প্রচার করিলেন, পরবর্তীকালে যে হিন্দু সমাজ রামমোহনের পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিলে ভুল হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি অবিসংবাদিতরূপে রামমোহনের যুক্তি অপেক্ষা অধিকতর সংগত ও গ্রহণীয়। প্রকৃত কারণ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ছিল হিন্দুর বিশ্বাস ও সংস্কারের অনুকূল এবং রামমোহনের সিদ্ধান্ত ছিল তাহার প্রতিকূল। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত গ্রহণ করিল এবং ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টধর্ম বাংলাদেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিল না।[১৩]

হিন্দুর বিশ্বাস ও সংস্কারের অনুকূলে সিদ্ধান্ত টানিবার মানসেই বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান কালের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়া হিন্দু ধর্মে কৃষ্ণ ও ভগবদ্গীতার স্থান বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রীষ্টান মিশনারীরা বলিতেন যে এই নবকৃষ্ণ আন্দোলনের ফলে বাঙালীরা কৃষ্ণকে খ্রীষ্টের এবং গীতাকে বাইবেলের আসন দিয়াছে অর্থাৎ শুধু সাহিত্যে নয় বাঙালী জীবনে ও সামাজিক কর্মে ও আধ্যাত্মিক সাধনায় গীতার স্থান ও শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রটি বঙ্কিম নব্যবংগে বলিষ্ঠতার সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ছিল -বিশেষতঃ জীবনের উত্তর পর্বে - ধর্মানুশীলনের ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ। আর হিন্দু ধর্মানু-

জীবনের মূল ভিত্তি ছিল নিস্কাম কর্মব্রত গ্রহণ ও সমাজের কল্যান আনয়ন। তাঁহার "আনন দ মঠ" পাঠে এই সত্য যথার্থই উপলব ধি করা যায় -আনন দমঠের সন্ন্যাসী-দের ত্যাগব্রতের দৃস্টান্ত দিয়া সমাজ জীবনে বঙকিম নিস্কাম কর্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

পূর্বে সন্ন্যাসীদে র ধারণা ছিল সন্ন্যাস জীবনের উদ দেশ্য নির্জনে বসিয়া সাধন ভজন করা। নিজের মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মতে লীন হওয়াই ছিল সাধন ভজনের মূল লক্ষ্য। তৎকালীন সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বঙকিমচন দ্র সন্ন্যাসী সন্তানদের কর্তব্য নিরূপন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর কর্তব্য সনাতন ধর্মরক্ষা ও সমাজের উন্নয়নের জন্য অর্থোপার্জন। আনন দমঠের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সন্ন্যাসী সন্তানদের কর্তব্য বঙকিমের লেখনীতে প্রকাশিত হইয়াছে এইভাবে :

"ব্রহ্ম চারী জিজ্ঞাসা করিলেন -তুমি দীক্ষিত হইবে ?

সে বলিল - 'আমাকে দয়া করুন'।

তখন তাহাকে ও মহেন দ্রকে সম্মোন ধন করিয়া সত্যানন দ বলিলেন- "তোমরা যথাবিধি স্নাত এবং অনশন আছ ত ?"

উত্তর। আছি।

সত্যা - তোমরা এই ভগবৎ সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর। সন্তান ধর্মের নিয়ম সকল পালন করিবে।

উভয়ে - করিব।

সত্যা - ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর। আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জন করিবে না। যাহা উপার্জন করিবে তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?

উভয়ে - দিব।

সত্যা- সনাতন ধর্মের জন্য সমুখে অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

উভয়ে- করিব।

সত্যা - রণে কখন ভংগ দিবে না?

উভয়ে - না।

সত্যা - যদি প্রতিজ্ঞা ভংগ হয়?

উভয়ে - জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"[১৪]

সন্ন্যাসীর অপর একটি কর্ত্তব্য জাতি ধর্ম নিরূপন করা চলিবে না। সকলে একজাতি। এক মায়ের সন্তান। তাই সত্যানন্দের প্রশ্ন।

"সত্যা। আর এক কথা - জাতি।

তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জানি অপরটি কি জাতি? অপর ব্যক্তি বলিল

"আমি ব্রাহ্মণকুমার।"

সত্যা - উত্তম। তোমরা জাতি ত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতায়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই।

উভয়ে - আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।"[১৫]

গীতায় নিত্য সন্ন্যাসীর কথা বলা হইয়াছে। নিত্য সন্ন্যাসীর সংজ্ঞায় বলা হয় সংসার আশ্রম ছাড়িয়া সর্বকর্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না। সংসারে থাকিয়া রাগ দ্বেষাদি ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে যিনি কর্ম করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। গীতায় সন্ন্যাসীর আদর্শেউদ্বুদ্ধ হইয়াই বঙ্কিম সন্ন্যাসী-দের চরিত্রে সমাজ বহির্ভূত আদর্শের রূপায়ণ করেন নাই। তাই তাহার পরিকল্পিত সন্ন্যাসী সমাজের ধারক ও পোষক -মুমুক্ষু হইয়া নির্জনে সাধনা নয়। তাহার আদর্শ হইল সনাতন ধর্মের জন্য আবশ্যক হইলে সুযুৎ অস্ত্রধারণ এবং বৈষ্ণব ধনাগারে স্বোপার্জিত অর্থ প্রদান। এই প্রসংগে বৈষ্ণব শব্দটির অর্থ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বিষ্ণুর সেবক, অপত্য, জাত ইত্যাদি অর্থে বৈষ্ণব শব্দটি প্রযুক্ত হয়। 'যজ্ঞ : বৈ বিষ্ণু :।' আবার যজ্ঞ ব্রহ্মোদ্ভব -কাজেই বিষ্ণু শব্দ দ্বারা ব্রহ্মা-নন্দ বুঝায়। পুরাণ মতে বিষ্ণুকে বলা হয় পালন কর্তা। সুতরাং বৈষ্ণব ধনভাণ্ডার মানে যাহাদ্বারা বিশ্বের -বিশ্বমানবের কল্যান হয় - সেই ধনভাণ্ডার। এই দিক হইতে বিচার করিলে -নিজের ব্যক্তি জীবনের উন্নতির জন্য নয়। সমষ্টি মানবের সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধনই সন্ন্যাসী জীবনের ব্রত।

বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে জাগ্রত করিতে নিষ্কাম কর্ম শিখাইতে মাতৃমূর্ত্তির রূপদান করিলেন সাহিত্যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মাতৃসাধনায় সিদ্ধ সাধকরূপে সাধনার ফসল তুলিয়া দিলেন বিবেকানন্দকে, বিবেকানন্দ সেই ফসল বিতরণ করিলেন সারা জগৎময় -

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবপ্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।[১৭]

গীতায় ভগবানকে 'মাতা' 'ধাতা' 'পিতামহরূপে' সম্বোধন করা হইয়াছে। ভগবানকে ভালবাসিয়া অর্থাৎ ভগবানে চিত্ত সমর্পন করিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে ভালবাসিবার ও রক্ষা করিবার কর্মকৌশল গীতা জগৎকে শিখাইয়াছে।

"ধর্মসাধকেরা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম চেতনাকে সকল উদ্যমের লক্ষ্যস্থল করিয়াছিলেন, বঙ্কিম সামনে রেখেছিলেন সমাজকে। এবিষয়ে কোমতের যুক্তির সারবত্তাকে স্বীকার না করে তিনি থাকতে পারেন নি। অবশ্য সব কিছুর উপরে তিনি স্থাপন করেছিলেন ঈশ্বর ভক্তিকে। তাঁর কথাতে -

'কর্ম অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কর্মই কর্ম। যে কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।'

এটা গীতারই কথা।"[১৮]

বঙ্কিম নিজে কর্মযোগী ছিলেন না অর্থাৎ নিজে কোন প্রতিষ্ঠানাদি সংগঠন করিয়া দেশ ও সমাজ সেবায় লাগিয়া যান নাই। তিনি ছিলেন চিন্তা নায়ক- মানুষের বুদ্ধি ও চিত্তকে অনুপ্রাণিত করা ছিল তাঁহার কাজ। তাঁহার রচিত ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণ চরিত্র, পরে অসমাপ্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা তাঁহার বিবিধ বিষয়ের সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী - সব কিছুর মধ্য দিয়া তিনি আমাদের জীবনের আদর্শ কি ও কিভাবে তাহা লাভ করা সম্ভব - তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ সাহিত্য ছাড়াও তাঁহার জীবনের উত্তরভাগে রচিত উপন্যাসাদি ও রস সাহিত্যের মধ্যেও নিষ্কামসেবাব্রত, মানব প্রীতির -কাঠামো কি হইতে পারে তাহার সবল-

দুর্বল দিক কোথায় – এই সব লইয়া চিন্তা আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা জাতীয় জীবন গঠনে সমকালীন ও উত্তর কালের তরুণ-চিত্তকে অনুপ্রেরনা দিয়াছে, নেতৃত্ব দিয়াছে। বিংশ শতকে জাতীয় জীবনে যে বিরাট কর্ম যজ্ঞের –বিশেষ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন হইয়াছিল তাহার মানসিক নেতৃত্ব দিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট আদর্শ। এই বিষয়ে আবার পরে আলোচনা করিব। এইখানে শুধু এই কথা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে সেই বিপুল সামাজিক উদ্যমের মূলে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিলেন – তাহার উৎস শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ :: আন্দোলন ও কর্মধারা।

বিংশ শতাব্দীর হিন্দুধর্ম ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের হিন্দুধর্ম - এই উভয়ের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান সহজেই পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিম চন্দ্রের প্রচার ব্যতীত বাঙলার সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন আরও একটি ব্যাপারে নতুন জীবন প্রত্যয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব একটি এগনিকারী ঘটনা একথা বলিলে অত্যুক্তি হয়না। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালী সমাজে যে অভূতপূর্ব, যুগানুকারী ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিলেন তাহার মর্ম উদ্ঘাটন করিলেও দেখা যাইবে যে তাহার প্রধান প্রেরণা ছিল দুইটি ভাগবত শরণাগতি ও নিষ্কামকর্মে ব্রতী হওয়া। আর অনায়াসেই অনুভূত হয় যে এই দুইটি প্রেরণার মূল উৎসস্থল ছিল হইল শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

বিংশ শতকের প্রথম পাদে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের রশ্মিটি ছিল যুগনেতা শ্রীঅরবিন্দের [১৯] হাতে। শ্রীঅরবিন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও কর্মধারা হইতে কতখানি প্রভাবিত ছিলেন তাহা সুবিদিত। শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব উক্তি উদ্ধার করা যাউক :

"He (God) sent that man to Bengal and set him im the

temple of Dakshineswar in Calcutta and from North to South and East to West, the educated men, men who were the Pride of University, who had studied all that Europe could teach, came to fall at the feet of the ascetic. The work of salvation, the work of raising India was begun".

অর্থাৎ ঈশ্বর এই লোকটিকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন এবং কলিকাতার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বসিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তর থেকে দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমের শিক্ষিত মানুষ, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব, যাঁরা ইওরোপ যা শিখাতে পারত তাই শিখিয়েছিলেন। এই মানুষটির পায়ে মাথা ঝুঁড়তে এলেন। মুক্তির কাজ ভারতকে ~~জাগ্রত~~ জাগ্রত করবার কাজ শুরু হয়ে গেল।" ২০

শ্রীরামকৃষ্ণের গীতাভিত্তিক জীবনবোধ যে ভাবে সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারীর একটি মন্তব্য হইতে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি :

বর্ত্তমানকালে জনসেবা করিতে যাঁহারা ব্যস্ত তাঁহাদের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সতর্কবাণী স্মরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক, অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম করিয়া ও সমস্ত ধন সম্পত্তি ব্যয় করিয়া শেষে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া অনেকে দুঃখ করিয়া থাকেন। ইহার রহস্য আর কিছু নহে। প্রথম হইতেই ~~xx~~ তাঁহাদের

মনের ভাব বিশুদ্ধ ছিল না। তাহাতে কলুষ কালিমা ছিল। দই এর হাঁড়িতে দুধ রাখিতে গেলে সেই দুধ নষ্ট হয়। এক বিন্দু দই ও দুধকে নষ্ট করে। নাম যশ, ধন সম্পত্তি প্রভৃতি লাভ করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভিত্তির উপরই তাহাদের কার্যসৌধ নির্মিত হইয়াছিল। তাহা ধূলিস্মাৎ হইলে দুঃখ পাইতে হইবে ইহাতে আর আশ্চর্যের আশ্চর্য কি? এই সমস্ত দোষ দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন :

'তোমরা বল জগতের উপকার করা। জগৎ কি এতটুকু যা? তাকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎ কর। তাঁকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে সকলের হিত করিতে পার। নচেৎ নয়।'

জনসেবা করিবার প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশমত ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ভক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। সেবা করিবার সংগে সংগে অনুক্ষণ স্মরণ করা কর্তব্য। সবই ঈশ্বরের, সবই শ্রীহরির সেবা ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে। এই-ভাবে স্মরণ মনন করিয়া কাজ করিলে কোন বিঘ্ন হইবে না। এমনে এমনে অভ্যাসের গুণে জনসেবাও আনন্দপ্রদ হইবে। মহাত্মাজীর সাফল্য বা বিজয় লাভের ইহাই রহস্য। ইহা আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি। চলিবার সময় মানুষের সংগে সংগে তাহার ছায়াও চলে, তাহারই অনুগমন করে। সেই প্রকার মহাত্মাজী তাঁহার প্রতিকার্যে প্রতি সংকল্পে নিরন্তর ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেন। সেইকারণেই তাঁহার কোন কার্যেই বিঘ্ন ঘটিত না, বরং তিনি সর্বদা জয়যুক্ত হইতেন।" [২১]

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, রামমোহন, 'ইয়ং বেংগল দল' বিদ্যাসাগর এবং সশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্ম ও আদর্শকে একটি নতুন ইহসচেতন মানবমুখী

জীবনের দ্বারা পরিমার্জিত করিবার মানসে গীতার নিষ্কামকর্মকেই মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে শ্রীগীতার নিষ্কামকর্মের আদর্শই যেন আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিতে উজ্জ্বলতর রূপে প্রমূর্ত হইয়া উঠিল।

গীতা জগৎকে শিখাইয়াছে কর্মের সহিত ধ্যানের, ধর্মের সহিত ইহজীবনের এবং মুক্তির সহিত ভক্তির সমন্বয় সাধন। এই মহাসমন্বয়াদর্শের মূর্ত-রূপে ছিলেন শ্রীশ্রীপরমহংসদেব। সমাজ জীবনে এই আদর্শ রূপায়ণের জন্য আসিলেন বিবেকানন্দ ঠাকুরের মানস পুত্র। বিবেকানন্দ গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র পাইয়া বনে জংগলে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন না। সমাজ জীবনে থাকিয়া নরের মধ্যে নারায়ণ রূপ, আর্তের সেবায় ভগবৎ সেবা –এই সত্য দর্শন করিয়া সন্ন্যাসজীবনের নূতন আদর্শ স্থাপন করিলেন সমাজ জীবনে।

"বিবেকানন্দের সর্বকর্ম ধ্যানধর্ম এই অসহায় মানবসংঘকেই নিবেদিত। এ জীবনাদর্শ তিনি তাঁর গুরুর কাছে থেকেই আশীর্বাদ স্বরূপ লাভ করেছিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণ এমন এক বিচিত্র ধরণের ধর্মগুরু যিনি ধর্মের সংগে ইহজীবনের জ্ঞানের সংগে কর্মের মুক্তির সংগে ভক্তির সহযোগ ধরতে পেরেছিলেন। পরমহংস ত্যাগী কিন্তু মানুষের সংগে তাঁর প্রেমের যোগ হয়েছিল বলে তিনি শুষ্ককাষ্ঠ ত্যাগের অনিকেত যাত্রাপথ ত্যাগ করে 'রসে-বশে' মগ্ন হয়েছিলেন। এই বিবর্ণ জীবনকেও পরমপ্রীতির মধ্যে উপলব্ধি করা পাঞ্চভৌতিক জীবনসত্তাকে ক্ষিত্যপতেজ মরুদ্ ব্যোমের অণু-পরমাণুরূপে না দেখে চিণ্ময় প্রাণকণিকারূপে উপলব্ধি করার গুরুমন্ত্র বিবেকানন্দ

দক্ষিণেশ্বরের সাধকের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।" [২২]

উনিশ শতকের শেষভাগে ধর্মীয় জাগরণের দ্বারা সমাজ জীবনের পরিবর্তনের ধারায় গীতার প্রভাব লক্ষনীয় – পরমহংসদেবের এবং বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী পর্যালোচনায় এই সত্য পরিলক্ষিত হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সমস্ত জীবনী ও বাণীর মধ্যে গীতার প্রভাব বিস্ময়কর। গীতার ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন মানুষের কাছে এই মহাগ্রন্থের বিচিত্র সংবেদন কোন কালেই পুরাতন বা জীর্ণ হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় গীতার দুরূহতম তত্ত্ব সাধারণ মানুষের জীবনের অতি নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তের সহিত অনেকেরই পরিচয় আছে। কিন্তু আগাগোড়া পূর্ণ ও সুসমঞ্জসভাবে গীতাতত্ত্বই যে রামকৃষ্ণ তাঁহার নিজস্ব ঢংএ নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন এই বিষয়ে বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি স্বতন্ত্র-ভাবে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ রচিত দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ 'গীতা-তত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থখানি।

সর্বত্র গীতার দান ঠাকুর পরমহংসদেব ছোট্ট একটি সুন্দর কথায় বলিয়াছেন – "গীতা পড়লে কি হয়? দশবার গীতা' 'গীতা' বললে যা হয়। গীতা গীতা বলতে বলতে ত্যাগী হয়ে যায়।" [২৩]

আবার আর একস্থানে বলিয়াছেন – "গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার গীতা গীতা বললে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগী।"

'গীতার এই শিক্ষা, হে জীব সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর।'

গীতার এই ত্যাগী ভাষ্যের প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই ছিলেন গীতার মূর্ত্ত বিগ্রহ সর্বত্যাগী। ভোগমুখী সমাজকে এবং ভোগসর্বস্ব জীবনকে সেবাপরায়ণ ও নিষ্কাম কর্মী গঠনের সঙকল্পে বহু ত্যাগী ও গৃহীভক্তদেরও তিনি বারবার গীতার এই ত্যাগের মন্ত্র শুনাইয়াছেন। পরমহংস তত্ত্বের ধারণা ঠাকুর ত্রিগুণাতীত তত্ত্ব হইতে লাভ করিয়াছেন। গীতায় ভগবান অর্জুনকে'নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জুন' -(২-৪৫) অর্থাৎ ত্রি গুণ রহিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। ত্রিগুণাতীত না হইলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না - ত্রিগুণাতীত পুরুষ ঈশ্বরলাভের অধিকারী। ঠাকুর এই ত্রিগুণাতীত অবস্থাকেই পরমহংসতত্ত্বের অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :

পরমহংস তিন গুণের অতীত তার ভিতর তিন গুণ আছে, আবার নাই, ঠিক যেন বালক, কোন গুণের বশ নয়। তাই ছোট ছেলেদের পরমহংসরা কাছে আসতে দেয় তাদের স্বভাব আরোপ করবে বলে।" (কথামৃত - ৭/১/৬১) [২৪]

আবার কতকগুলি স্থানে বলিয়াছেন :

"পরমহংস বালকের ন্যায় - আত্ম পর নাই, ঐহিক সমুদ্রের আঁট নাই। রামলালের ভাই একদিন বলছে, তুমি খুড়ো, না শিবে ?" [২৫]

পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে - কোথায় যাচ্ছে, কোথায় চলছে - হিসাব নাই। রামলালের ভাই হৃদের বাড়ী দুর্গাপূজা দেখতে গিছিল। হৃদের বাড়ী থেকে ছুটকে আপনা আপনী কোন দিকে চলে গেছে। চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা করেছে 'তুই কোথা থেকে এলি? তা কিছু বলতে পারে না। কেবল বললে -'চালা' (অর্থাৎ যে আট চালায় পূজা হয়েছে)

যখন জিজ্ঞাসা করলে কার বাড়ী থেকে এসেছিস? তখন কেবল বলে দাদা। "

(ক ৪*১৫/২/১২১-২২) [২৬]

পরমহংসদেব গীতায় প্রচারিত কর্মজ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। গীতায় জ্ঞান ও ভক্তিকে একভক্তি বিনিময়তে বলা হইয়াছে। ঠাকুরের ভাষায় -পূর্ণজ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই নেতি নেতি বিচারের শেষ হলে ব্রহ্মজ্ঞান তারপর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ।*****

যার উচ্চবোধ আছে, তার নীচুবোধ আছে, জ্ঞানের পর উপর নীচে এক বোধ হয়। "প্রহ্লাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান হত, সোহহং হয়ে থাকতেন, যখন দেহ-বুদ্ধি আসিত। দাসোহহম্, আমি তোমার দাস এই ভাব আসিত।"

" কেন ভক্তি নিয়ে থাকা? তা না হলে মানুষ কি নিয়ে থাকে? কি নিয়ে কাটায় (ক/৪/২৩)

জ্ঞান ও ভক্তির নিকট সম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়া ঠাকুর আরও একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন।

"জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিস। তবে একজন বলছে জল আর একজন বলছে জলের খানিকটা চাপ।"[২৭]

আবার ভক্তিপথে জ্ঞানের উদয় হয়। ভগবান নিজেই বলিয়াছেন -

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।। [২৮]

অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা ভক্ত ভগবদতত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন। ভগবান কে? তাঁহার

সমগ্র বিভাব বা কি। এইরূপে তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিয়া ভগবানে প্রবেশ করেন। ঠাকুর সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন –

"যত এগিয়ে যাবে ততই ভগবানের উপাধি কম দেখতে পাবে। ভক্ত প্রথমে দর্শন করলে দশভুজা। আরও এগিয়ে দেখলে ষড়ভুজা আরও এগিয়ে গিয়ে দেখছে দ্বিভুজ রাধাকৃষ্ণ গোপাল। যতই এগুচ্ছে ততই ঐশ্বর্য কমে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গেল তখন জ্যোতিঃ দর্শন করলে কোন উপাধি নাই। [২৯]

কর্ম আবার জ্ঞানে গিয়া পরিসমাপ্তি লাভ করে। " সর্ব কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" [৩০] তখন সবই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। সাধক নিজেও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া এই চরম অবস্থার কিছুটা আভাস দিয়াছেন।

ঈশ্বর দর্শন করলে কর্মত্যাগ হয়। আমার ঐরকমে পূজা উঠে গেল। কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়। মানুষ জীব জন্তু –সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্পবর্ষন করতে লাগলাম যা দেখি তাই পূজা করি।" [৩১]

এই প্রসংগে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচর স্বামী সারদানন্দের উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য।

ঠাকুরের সমস্ত জীবনটাই গীতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁহার বাণী গুলিও গীতাভিত্তিক। বিভিন্ন ধর্মমতের সাধনে সিদ্ধি ও বহু ধর্মমতের পরিচয় লাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল "সর্বধর্ম সত্য –যত মত তত পথ মাত্র।" [৩২] তাঁহার ধর্মমতের ইহা একটি প্রধান ও শ্রেষ্ঠ উক্তি এবং বর্তমান যুগে ইহা একটি মহান

আদর্শ। গীতার সমন্বয়ের বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন মধ্যে মূর্ত দেখিয়া বিবেকানন্দ বলিতেছেন :

"The originality of the Gita, Yoga-Ynana, Bhakti etc. claiming superiority for his own chosen path; no one ever tried to seek for reconciliation among these different paths. It was the author of the Gita who for the first time tried to harmonise these. He took the best from what all the sects then existing had to offer and threaded them in the Gita ..... it was fully accomplished by Ramkrishna in this nineteenth century". ১১.

ঠাকুরের মূল দর্শন হইল সর্বধর্ম সমন্বয়। অবশ্যই ঠাকুর নিজের জীবনে সবরকম উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া - সিদ্ধান্তের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। তবে ইহার তাত্ত্বিক ও দার্শনিক মূল গীতার সিদ্ধান্ত - ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই মন্তব্য স্বীকার করিয়াছেন। ঠাকুর পরমহংসদেবের অবতারত্বের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে জনৈক ভক্তের মন্তব্য স্মরণ করিয়া ডঃ মজুমদার লিখিয়াছেন :

"সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের

যথার্থ রূপ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যুগাবতার ঠাকুরের উহা প্রচার দ্বারা পূর্বক পৃথিবীর মর্মবিরোধ ও ধর্মগ্লানি নিবারণের জন্যই যে বর্তমান কালে আগমন একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ কোন অবতারই ইতঃপূর্বে সাধন সহায়ে ঐ কথা নিজ জীবনে পূর্ণ উপলব্ধি পূর্বক জগৎকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইয়া অবতার সকলের স্থান নির্দেশ করিতে হইলে, ঐ বিষয়ে প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন দেহে সর্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয়।"[৩৪]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব প্রচারিত ধর্মমতকে নবহিন্দুধর্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়। কারণ হিন্দুধর্ম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে ও উপদেশে যেরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাই বর্তমানযুগে বিশেষভাবে প্রচলিত।

রামমোহন রায় বেদ-বেদান্ত উপনিষদ মানিতেন। কিন্তু পরবর্তী পৌরাণিক যুগে হিন্দু ধর্মের যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাহা প্রকৃত হিন্দু ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার ধর্মমতের দুইটি দৃঢ় স্তম্ভ ছিল। প্রথমত একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরে অবিচলিত নিষ্ঠা, দ্বিতীয় প্রতিমাদিরূপে তাঁহার ধারণা, পূজা উপাসনা প্রভৃতির সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান। এই দুইটি বিষয়েই ঠাকুর তাঁহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা রামমোহনের মতের বিরুদ্ধে প্রচলিত হিন্দুধর্মের অর্থাৎ সাকার ভগবানে বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতিমা পূজার দ্বারা সার্থকতার প্রতি সর্বসাধারণের বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা যে ধর্মের একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি ও বেদান্ত বর্ণিত মোক্ষলাভের অন্যতম উপায় ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করিয়া কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? আর

ঠাকুরের ন্যায় কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবী বিশ্বাস করিয়াও যদি আধ্যাত্মিকতার চরমে পৌঁছান যায় তবে সাকার ভগবানে বিশ্বাস সমূলে বর্জন করিবার প্রয়োজন কোথায়? এই প্রকার সহজ যুক্তির বলেই ঠাকুরের প্রভাবে খৃস্টান ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় কর্তৃক বহুনিন্দিত পৌরাণিক ধর্মে হিন্দুর বিশ্বাস দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"[৩৫]

শিবজ্ঞানে জীব সেবা – ইহা বিবেকানন্দের জীবন দর্শন। এই দর্শন তিনি গুরুর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দের উদ্ধৃতি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়

''১৮৮৪ খৃস্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেনদ্রও সেখানে উপস্থিত। বৈষ্ণব ধর্মের প্রসংগে ঠাকুর বলিলেন যে এই ধর্মের মতের সারমর্ম "নামে রুচি জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন" ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিলেন –কৃষ্ণেরই জগৎসংসার একথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্বজীবে দয়া – এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন – জীবে দয়া। জীবে দয়া। দূর শালা। কীটাণুকীট – তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।

নরেন্দ্র নাথ বাহিরে আসিয়া বলিলেন:

'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম ·····

কিন্তু ঠাকুর ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল বনের বেদান্তকে ঘরে

জানা যায়। সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল। ঈশ্বরই জীব ও জগৎ রূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছে।..... সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপ শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলেই আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহা দিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায় ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে চিত্তশুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকে চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।.....

শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবে সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন পূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্ত সাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য।

কর্ম না করিয়া দেহী যখন এক দণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' রূপে কর্মানুষ্ঠানের কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং উহা করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইবে, একথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভগবান যদি কখনও দিন দেন ত আজ যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব, - পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"[৩৬]

"ভগবান দিন দিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ এই ভিত্তির উপরই শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় ভারতের সর্বত্র প্রসারিত রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঠাকুরের ভক্তি শিবজ্ঞানে জীবসেবা" এবং তাঁহার প্রবর্তিত এই উক্তি সূচক দরিদ্র নারায়ণ এই শব্দটি ভারতের নব্য

হিন দু ধর্মের ইতিহাসের অমর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।" ৩৭

"শিবজ্ঞানে জীব সেবা"- এই দর্শনের মূল ভিত্তি হইল শ্রীমদ ভাগবদ গীতা গীতার 'সর্বভূতাত্ম ভূতাত্মা' মন্ত্রের জীবন্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন দ। আমরা যখন বিবেকানন দের কণ্ঠে শুনি -

"শুন বলি মরমের কথা জেনেছি জীবনে সত্য।
তরংগ আকুল ভবঘোর একতরী করে পারাপার।।
মন ব্রতন ত্র প্রাণ নিরুজন, মতামত, দর্শন, বিজ্ঞান
ত্যাগ ভোগ-বুদ ধির বিভ্রম, প্রেম, প্রেম এইমাত্র ধন।
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পন, কর সখে এসবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।" ৩৮

তখন আত্ম দর্শন জনিত সমত্ববুদ ধির এবং বিশ্বপ্রেমের অনুভূতির চিত্র ভাসিয়া উঠে।

এই আত্মারাম কর্মযোগীর কর্মের ফলেই বিবেকানন দ ও সেবাধর্মী সন্ন্যাসীবৃন দ তাঁহাদেরই নিস্কামকর্মের রূপায়ন রামকৃষ্ণ মিশন, নগরে পল্লীতে, তীর্থ ক্ষেত্রে সেবাশ্রম, নিয়ত নরনারায়ণ সেবা, আর্ত্ত, পীড়িত, দুঃখদৈন্যগ্রস্থ শত-সহস্র জীবের কল্যান। এই সন্ন্যাসীবৃন দ ত্যাগী, কিন তু কর্মত্যাগী নহেন। কর্মযোগী। তাই তাঁহারাই জনসেবার প্রকৃষ্ট অধিকারী। তাঁহারা নিজের মোক্ষের জন্য ব্যাগ্র নহেন।

তাহাদিগের নিকট জনসেবা ব্যক্তিগত মোক্ষেরও উপরে।" স্বামীজীর উদাত্ত কণ্ঠে উদ্ঘোষিত হয় মহাবাণী – "আমি ভক্তি চাই না মুক্তি চাই না, আমি হাজার নরকে যাব –বসনুবল্লোকেহিয়ুং চরনুঃ।' যিনি বিশ্বাত্মার উপাসক বিশ্বকর্মা, তিনি বিশ্বমানবের দুঃখ দুর্দশা উপেক্ষা করিয়া কেবল নিজমুক্তি সাধনায় জীবনক্ষেপ করেন না। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বিশ্বকর্মার সুর প্রতিধ্বনিত হইতেছে –

" চাহিনা ছিঁড়িতে এক বিশ্বব্যাপী ডোর,

লক্ষকোটি প্রাণীসাথে একগতি মোর।।

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ,

আমি একা বসে রব মুক্তি সমাধিতে। "

বিবেকানন্দ সমস্ত জীবন ধরিয়া নিষ্কামকর্ম দ্বারা সমাজ জীবনকে উজ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং নিষ্কামকর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দের অভিমত জানা প্রয়োজন।

১৮৯৮ খ্রীঃ ২০ শে মার্চ কলিকাতা বাগবাজারে ৫৭নং রামকানু বসু স্ট্রীটে রামকৃষ্ণ মিশনের ৪২তম অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ নিষ্কামকর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় এইভাবে বলিয়াছিলেন :

"গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয় তখন দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল মত-বিরোধ চলিতেছিল একদল বৈদিক যাগযজ্ঞ পশুবলি এবং ঐ প্রকার কর্ম সমূহের সমষ্টিরূপ বলিয়া মনে করিত। অপর দল প্রচার করিত যে অসংখ্য অশ্ব ও পশু হত্যা করিয়া ধর্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। শেষোক্ত দলের অধিকাংশই

ছিলেন সন্ন্যাসী ও জ্ঞানমার্গী। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে সর্বপ্রকার কর্মত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভই মোক্ষের একমাত্র পথ। গীতাকার তাঁহার নিষ্কাম কর্মের মহতীবাণী প্রচার করিয়া পরস্পর বিরোধী এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান করিলেন।"[৩৯]

এক্ষণে নিষ্কামকর্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দের অভিমত জানা প্রয়োজন।

বিবেকানন্দের ভাষায় -

"Nishkama Karma or work without desire or attachment people now a days understand what is meant by this in various ways. Some says what is implied by being unattached is to become purposeless. If that were its real meaning then heartless brutes and the ealls would be the best exponents of the performance of Nishkama Karma. Many others, again give the example of Janaka, and wish themselves to be equally recognised as past masters in the practice of Nishkama Karma! Janaka did not acquire that distinction by bringing forth children but these people all want to be Janakas, with the sole qualification of being the fathers of a breed of children. No! the true Nishkama Karmi (Performer of word without desire) is neither to be like a brute nor to be inert, nor heartless. He is not Tamasika but of Pure Sattva. His heart is so full of love and sympathy, that he can embrace the whole world with his love. The world at large cannot generally comprehend his all embracing love and sympathy." [৪০]

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন Mill এর utilitarianism এবং Comte's positivism তাৎকালীন বৈদ্ধিজীবীদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সেই সময় বিবেকানন্দ Socialism এর মূল মন্ত্র শুনাইলেন জাতিকে।

"ইচ্ছা হয় মঠ ফঠ বিক্রী করে দেই। এই সব গরীব দুঃখী দরিদ্র নারায়ণদের বিলিয়ে দিই। আহা দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না – আমরা কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? এক এক সময় মনে হয়, ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া নিজে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা, দরিদ্র নারায়ণদের সেবা করেই জীবনটা কাটিয়ে দিই। আহা দেশের গরীব দুঃখীদের জন্য কেউ ভাবে নারে। যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে – যে মেথর মুদ্দাফরাস কাজ বন্ধ করলে একদিকে শহরে হাহাকার উঠে যায়, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের দুঃখে সান্ত্বনা দেয় দেশে এমন কেউ নাইরে। আমরা দিন রাত তাদের বলছি ছুঁসনে ছুঁসনে – দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ? কেবল ছুঁৎমার্গীর দল। এমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা মার লাথি।" [৪১]

এই ছত্রগুলি পাঠ করিবার সংগে সংগে আমাদের মনে হয় বিবেকানন্দ একজন সমাজতন্ত্রবাদী। এমন কি তিনি নিজেও বলিয়াছেন – I am a Socialist তাঁহার অন্তরের ছবি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে যখন তিনি বলেন –

"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক, বেরুক

লাংগল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালো মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, বাজার থেকে। বেরুক খোপ জংগল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। ----- অতীতের কংকালে কংকালে এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভারত।" [৪২]

তখন সত্যই মনে হয় ইহা যেন আজিকার সমাজতন্ত্র অভিমুখী ভারত আত্মার মর্মবাণী।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য বিবেকানন্দের মানবপ্রেম ও সমাজ সেবা পাশ্চাত্য জাতির প্রচারিত মানবতাবাদ হইতে পৃথক। বিবেকানন্দের সমাজসেবার মধ্যে গীতার কর্মনীতির আদর্শের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক সমাজতন্ত্রবাদের কর্মনীতি ও গীতার কর্মনীতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে।

সমাজতন্ত্রবাদের একটি মূলনীতি হইল এই যে, সমাজের সকলকে সমভাবে ভোগ করিতে না দিয়া নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করা চৌর্য্য মাত্র (property is Theft) সমাজতন্ত্রের অনুরূপ আদর্শ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে –

"যাবৎ ভ্রিয়ত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি।।"[৪৩]

অর্থাৎ যে পরিমান ধনাদিতে নিজের ভরণপোষন হয় তাহাতেই দেহীদিগের স্বত্ব,

যে তাহার অতিরিক্ত ধনসম্পত্তির অভিলাষ করে সে চোর, সে দণ্ড পাইবার যোগ্য। গীতাতে উক্ত নীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

" তৈর্দত্তান প্রদায়েভ্যঃ যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ ।" [৪৪]

অর্থাৎ দেবতাদিগকে না দিয়া যাঁহারা শুধু নিজেরাই নিজেরই জন্য ভোগ করে তাহারা চোর বলিয়া গণ্য হয়। তাৎপর্যানুসারে দেবতার অর্থ এখানে উৎপাদনে ও জীবন ব্যাপারে সহায়তা যাঁহারা করেন তাঁহারা।

পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদে ঈশ্বর ও ধর্মের কোনো বিশিষ্ট স্থান নাই। গীতায়ও সমাজতন্ত্রবাদের কর্মনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গীতোক্ত কর্মনীতির ঈশ্বর বা ধর্ম বিচ্ছিন্ন নহে। পরন্তু আত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরীয় কর্মের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। গীতার কর্মনীতির মূল কথা হইল নিষ্কাম কর্ম। গীতার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য -একটি ধর্মের বিভিন্ন পথগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন, অপরটি নিষ্কাম কর্ম। বিবেকানন্দের ভাষায় :

"The reconciliation of the diffetent paths of Dharma, and work without desire or attachment these are the two special characteristics of the Gita". [৪৫]

গীতোক্ত কর্মযোগী সংযত এবং সর্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া সর্বভূতহিতে রত থাকেন । গীতার ভাষায় - সংনিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ ।। [৪৬]

বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টতই দেখা যায় তাঁহার জীবন ছিল গীতাভিত্তিক কর্মও ছিল গীতার আদর্শ অনুশীলনের ফলশ্রুতি।

বিবেকানন্দ যে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই যুগে অধিকাংশই বুদ্ধিজীবীদের মনে ধারণা জন্মাইয়াছিল মানব মননশীলতার চর্চা ও মানব মনের পরিতৃপ্তি সাধনের উৎস পশ্চিমদেশীয় সভ্যতার আলোক। বিবেকানন্দ পশ্চিমমুখী দৃষ্টিভংগীকে পূর্বমুখী করিয়া দিলেন। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার আলো বিশ্বের মুক্তিকামী ও শান্তিকামী মানুষকে পথ দেখাইতে পারে - এই মহাসত্য বিবেকানন্দ পশ্চিমের দুয়ারে যখন ঘোষণা করিলেন তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণী ও গুণীজনদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল।

বিবেকানন্দ মুক্তিকামী সন্ন্যাসীদের নূতন চেতনা জাগাইলেন। সন্ন্যাসীদের ধারণা ছিল হিমালয় পথগামী হওয়াই সন্ন্যাস সন্ন্যাসজীবনের মূল উদ্দেশ্য। বিবেকানন্দ আকাশমুখী ধর্মের চেতনাকে পৃথিবীমুখী অর্থাৎ দেশমুখী করিয়া দিলেন। বিবেকানন্দ সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন গীতার বাণী সমূহ -"নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু" (১১/৫৫ গীতা) অর্থাৎ সর্বভূতে তিনিই আছেন বলিয়া কোথাও বৈরীভাব থাকতে পারে না। সুতরাং জীবের প্রতি অবজ্ঞা ঘৃণা বা বৈরভাব পোষন করিলে ঈশ্বরপ্রীতি হয় না। তাই তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল -

"হে ভারত ভুলিও না তোমরা নারীজাতির আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর, ভুলিও না তোমার বিবাহ

তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিওনা নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর – সদর্পে বল আমি ভারতবাসী। ভারতবর্ষ আমার ভাই। বল মূর্খ দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল – ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, ভারতের কল্যান আমার কল্যান আর বল দিনরাত হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"[৪৭]

এই বীরবাণী শুনিতে শুনিতে মনে হয় যেন পার্থসারথির শান্ত ও উদাত্ত আহ্বানে সহস্র সহস্র বৎসরের স্থানকাল সীমা অতিক্রম করিয়া নবযুগের সব্যসাচী নিস্কামকর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দকে আহ্বান করিয়াছেন।

ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ নৈতৎত্ব্যুপপদ্যতে।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।।[৪৮]

আর স্বামীজী নষ্টমোহগতসন্দেহ পার্থের মত রণহুংকার দিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া বলিতেছেন – "করিষ্যে বচনং তব"।

এক অভিনব দিব্য প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীকে এক নূতন দেবতা দিয়াছিলেন – সে দেবতা ভারতমাতা। এই দেবতার নিকট আত্ম সমর্পন করিয়া সৌভ্রাতৃত্বের ও মানবপ্রেমের যে অমৃতময় বাণী তাঁহার কণ্ঠে উদ্ঘোষিত

হইয়াছিল – একটু অবহিত হইলেই বুঝা যাইবে যে তাহা পাক জন্যের সিংহনাদের অনুরণন।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও সমাজসেবা ॥

উনিশ শতকের বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়া যে সমন্বয় আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল সেই সমন্বয়ের আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিল রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও শিক্ষাদর্শনে তথা জীবন দর্শনে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের বাস্তব রূপায়ন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় - যাহার মূল সুর হইল -'যত্র বিশ্ব ভবেত্যেকনীড়ম্' অর্থাৎ 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' সকল বিরোধের মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টা, সকল বাদ প্রতিবাদের মধ্যে সমন্বয়ের সমন্বয়ের বাণী রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন ভারতবর্ষের অন্তর আত্মার স্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায় কোথায়? নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় শ্রীমদ্ ভাগবদ্ গীতায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

"ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।...

....

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃংখলাস্থাপন কেবল সমাজ ব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের যে সম্পূর্ণ সমাজ সংস্থাপনের চেষ্টা

দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।"[৪৯]

সুতরাং ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের চিরন্তনী বাণী বিরোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এই সনাতনী বাণী হইতে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদর্শনের মূল প্রেরণালাভ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা কথাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে : "আমরা মানুষ বলতে যা বুঝি আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে তদনুরূপ আদর্শ সম্পন্ন হবে। কারণ মানুষ করে তোলাই শিক্ষা।"[৫০] রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলিতে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা অথবা জ্ঞানের শিক্ষা বোঝেন নাই, বোধের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। জনৈক লেখক বলিয়াছেন - "wisdom is the principal thing, we get wisdom and with all thy getting get understanding". অর্থাৎ জীবনের সমস্ত কিছুর মধ্যে মধ্য দিয়া লাভ কর প্রজ্ঞা। ইহাই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ এই প্রজ্ঞার ভূমিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ গীতার মন্ত্র অনুভব করিয়াছেন, দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছেন -ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা মন বড়, মনের অপেক্ষা বুদ্ধি বড়, বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা। বোধের দ্বারাই হয় আত্মার সহিত যুক্ততা সাধন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

"ভারতবর্ষের সাধনা হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংগে চিত্তের যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। গীতা বলেছেন-

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।।

(৩) আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় ইচ্ছা জাগ্রত করা।

(৪) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করা, - যার সাহায্যে শিক্ষার্থী সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিরলস চেষ্টা করতে পারে।

(৫) শিক্ষার্থীর মনে ধর্মীয় মনোভাব এবং সংস্কৃতি বোধ জাগানো।

(৬) শিক্ষার্থীর সামাজিক গুণের বিকাশ সাধন করা।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির পূর্ণবিকাশের কথা বলেছেন। যে ব্যক্তি সংস্কৃতি সম্পন্ন ধর্মবোধ উদ্‌দীপ্ত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী সম্পন্ন এবং জীবনের মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দৃঢ় ইচ্ছা সম্পন্ন এবং যে অনন্ত আশা ও সাহস নিয়ে সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে উৎসাহী এবং যার কর্ম ও ব্যবহার সামাজিক মংগলের অনুবর্তী।"[৫২]

এই মনুষ্য অনুসরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাতত্ত্ব" বিশ্লেষণ করিলে চোখে পড়ে গীতার আদর্শের ভিত্তিতেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার লক্ষ্যকে নির্বাচন করিয়াছেন। আমাদের জীবনের যাহা লক্ষ্য মানুষের জীবনেরও তাহা লক্ষ্য হওয়া উচিত। গীতা মানুষের জীবনের লক্ষ্য নির্বাচন করিয়া দিয়াছে। দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে উত্তরণই মানব জীবনের লক্ষ্য। এই ভূমিতে উত্তরণের পথেই মানব জীবনে নামিয়া আসে পরিপূর্ণতা লাভের আনন্দ। "যতক্ষণ জীবনের লক্ষ্য একাধিক বস্তু, ততক্ষণ দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব আছে, ঘাত প্রতিঘাত আছে, তাপ-জ্বালা-দুঃখ" অশান্তি আছে। যখন একটিমাত্র সর্বচাইতে বৃহত্তম ও মহত্তম বস্তুর দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে ও অন্যান্য লক্ষ্যগুলি সেই পরম লক্ষের উপায়রূপে দৃষ্ট হইতেছে - তখনই শান্তির তোরণ উন্মুক্ত হইতেছে। জীবনের মধ্যে একটি (Goal) সাধ্যবস্তু চাই। যাহা হইবে (Be all and end all) জীবনের যথাসর্বস্ব। আর যাহা কিছু তাহারই জন্য। যাহা যাহা সেইবস্তুকে পাইবার পক্ষে অনুকূল এবং যতটুকু অনুকূল তাহা

ততটুকু হইবে চাওয়া ও পাওয়া। স্বাস্থ্য চাই, অর্থ চাই, বিদ্যা চাই, সমাজ চাই, পরিবার চাই, রাষ্ট্র চাই, স্বর্গ সুখ চাই -সব কিছুই চাই। সব কিছুর চাওয়া পর্যন্ত দ্বন্দ্বের ভূমির ঊর্দ্ধে উঠিবার উপায় নাই। সেই পরম কিছুর জন্য যখন সব কিছু, তখনই দ্বন্দ্বের ভূমি চলিয়া যাইতে থাকিবে। সেই একটি পরম কিছুকে পাইবার পক্ষে যাহা যাহা কিছু প্রতিকূল যত মূল্যবানই হউকনা কেন কিছুতেই সে সকল চাই না। এই-রূপ দৃষ্টিভংগী ও জীবননীতি অবলম্বন করিলে দ্বন্দ্বের অবসান।

সবখানি জীবন দিয়া সেই একটি বস্তুকে দেখিতে চাহিতে হইবে। সমস্ত মনপ্রাণ মন প্রাণ সমপ্রভাবে সেই একটি বস্তুকে চাহিতে হইবে। সমস্ত মন প্রাণ সমপ্রভাবে সেই একটি বস্তুর চিন্তায় ও ধ্যানে ভরপুর রহিবে।"[৫৩]

"যাহাকে পাইলে আর সকল রকম প্রাপ্তি, সকল প্রকারের লাভ ক্ষুদ্রা-দপি ক্ষুদ্র মনে হইবে। এমন একটি বস্তুকে সর্বাগ্রে খুঁজিতে হইবে যাঁহাকে পাইলে আর কোন লাভকে বড় মনে হইবে না - "যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" সেই পরমলাভই জীবনের লক্ষ্য।[৫৪]

"আমাদের জীবনের মধ্যে একটা বড়র চিন্তা একটা অসীমের চিন্তা জাগাতে হবে তাহলেআমাদের শিক্ষা জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।"[৫৫]

রবীন দ্র নাথ বিশ্বপ্রকৃতির সুরে সবচেয়ে যিনি বড় তাঁহার আহ্বানে আহ্বান শুনিয়াছেন :

"নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে। আপনাকে বিকশিত কর, আপনাকে সমর্পন কর। আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফেরো। এই জল স্থল আকাশে, এই সুখ দুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্ব-

চনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধর।"[৫৬]

তাই রবীন দ্র নাথের শিক্ষাদর্শে ''বড়র'' চিন্তা ''বড়''কে মহৎ করিয়া ভাবতে শিখিয়া জীবনকে উৎসর্গ করিবার প্রেরণা আছে :

"জীবনের ক্ষেত্রকে বড় করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড় করিয়া তোলা এবং বড় করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবতই মনে আসে না।"[৫৭]

গীতা ভাবনায় কবিচিত্ত অনুপ্রণিত। জ্ঞান লাভের জন্য কবি গীতার প্রণালীই গ্রহণ করিয়াছেন। (শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ) তাই রবীন্দ্র নাথ বলিতেছেন :

"শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরু গৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে।"[৫৮]

তিনি পুনরায় বলিতেছেন :

"আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যব্রত অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্ব লাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা – ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।"[৫৯]

গীতার সঞ্জীবনী মন্ত্রে কবিচিত্ত উদ্বুদ্ধ – তাই জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী-দের প্রতি কবির সঞ্জীবনী বাণী –

"তোমরা ভয়ে কাতর হইবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মান

হবে না। ধনের গর্বে স্ফীত হবে না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না। সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকলের স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন – এইটে নিশ্চয়ই জেনে আনন্দ মনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপনে করবে। সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে অথচ যখন কর্তব্য বোধে ধন সম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।"[৬০]

গীতায় জগদ গুরু শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই সংসার সমস্যাক্লিষ্ট নরের প্রতীক শিষ্য অর্জুনের সখ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। নিতান্ত দরদী জনের ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট সমুপস্থিত। এই প্রসংগে ভাগবতী গংগোত্তরীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

"গীতার উপদেশ বিপদাপন্ন প্রিয়জনের কণ্ঠধরা প্রিয়ার দরদ-মাখান সান্ত্বনা। অর্জুনকে ভালবাসেন বলিয়াই তো এত উপদেশ দেওয়া যত্তেহহং প্রিয়মানায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া – অর্জুন তোমাকে ভালবাসি, তাই বলিতেছি। এই যে প্রাণ নিঙড়ানো স্নেহধারা, ইহাই ফল্গুধারার মত সাতশত শ্লোকের অন্তঃস্থলে প্রবাহিত। তাই এত সরস মধুর ও সার্বজনীন।"[৬১]

এই দৃষ্টিকোণ হইতে রবীন্দ্রনাথ গুরুশিষ্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনে প্রয়াসী :

"গুরু শিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মধ্যস্থ বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা মনে ছিল। যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক

সাজুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই ,নইলে দেনা পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। ··········

······যিনি জাত শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তার ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি [illegible] বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে [illegible] উছ্বসিত হয় প্রাণে ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকে[illegible] থেকেই তাঁকে সুশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী তবে নির্ভয়ে তাঁর কাছে হাত বাড়া- তেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা সর্বদা নিজেদের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দূরবর্ত্তিতা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্র, প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্ত্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভ্রম নষ্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাঁদের সংগে সংগে ধ্বনি উঠছে 'চুপ', চুপ'। তাই পাকা শাখায় কচি শাখার ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে, চুপ করে যায় ছেলেদের চিত্তে প্রাণের ক্রিয়া।"[৬২]

তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি দেখিয়া শিক্ষার সত্য সন্ধানে রবীন্দ্র - নাথের দার্শনিক জীবনে প্রশ্ন জাগিয়াছে :

আমরা কী,আমাদের সার্থকতা কিসে? ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছে সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন মূর্ত্তি কীভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বল- প্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিস্কার করিলাম কি? আমরা কেবল -

ভয়ে ভয়ে যাই , ভয়ে ভয়ে চাই,

ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই ।

হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে ।························

···

এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই বেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না, সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই সকল নানাস্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্যদান করিবে। আমাদের চিন্নক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে, সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি নূতন ব্যাপ্তি লাভ এবং মানবের জ্ঞান ভাণ্ডার তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই। বিদ্যা-রই কি আর বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে। চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে তখনি সে অমৃত লাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে। নানাতথ্য নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে।"[৬৩]

নানাতথ্য নানাবিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতর রূপে নিজেকে উপলব্ধি করিবার শিক্ষা দিয়াছে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। সকল বিরোধের মধ্যে ঐক্যের সাধনা ও সামঞ্জস্য রূপায়ণে এবং সার্বজনীন শিক্ষাদর্শ প্রদর্শনে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অবদান চিরস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতাত্মার বুকে কান পাতিয়াছেন শুনিয়াছেন ভারতাত্মার সার্বজনীন বাণী। বিশ্বের বুকে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন, দান করিতে চাহিয়াছেন ভারতের অধ্যাত্ম সম্পদ। বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে গীতাভিত্তিক শিক্ষাদর্শকে মূর্ত্তি দিয়া বিশ্ববাসীর নিকট ভারতীয় ঐতিহ্যের আলো তুলিয়া ধরিয়া সবাইকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন –

"দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে

যাবে না ফিরে।

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।"[৬৪]

জীবনের মূল কেন্দ্রে আছে শিক্ষা। যথার্থ শিক্ষিত মানুষের কর্ম -জাতির তথা মানব সেবায় দিকে দিকে প্রসারিত হয়। রবীন্দ্র জীবন দর্শনে এই সর্বব্যাপী মানবত্বের বোধ চির জাগ্রত ছিল। তাঁহার মহামানব -ব্রহ্ম সত্তারই বাস্তব রূপ। তাই দেখা যায় যে জীবনে শুধু কাব্য রচনায় তথা শিল্প চর্চায় নহে, শিক্ষা বিস্তারে, কৃষি-শিল্প বিষয়ক বিভিন্ন কর্মে, গ্রাম পরিকল্পনায় মানুষের জীবন ও জীবিকার যাবতীয় দিকগুলিকে সুস্থ, সবল, স্বাধীনভাবে পুনর্গঠনের জন্য আমরন তাঁহার অক্লান্ত প্রয়াস। প্রথম যৌবনে যাহা শিলাইদহে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাই উত্তর পর্বে শান্তি-নিকেতনকে আশ্রয় করিয়া - শিক্ষায়, শ্রীনিকেতনকে আশ্রয় করিয়া কৃষি-শিল্প-সমবায়ে, আবার ব্যক্তিগত সাধনায় সেবায় রূপ পাইয়াছে। রাজনীতির সংগে প্রত্যক্ষ যোগ কাটিয়া গেলেও রাজনীতিকে মানব নীতির একটি অংগ হিসাবে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন - এবং বিশ্বরাজনীতির মধ্যে ন্যায়, প্রেম ও মানবত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ সংগ্রাম করিয়াছেন। ব্যক্তিগত লাভালাভাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া এই অক্লান্ত কর্মের প্রেরণা, অপরাজেয় উদ্যম, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আত্ম সমর্পনের সুর -সবগুলিই উপনিষৎ হইতে উৎসারিত। আর গীতা উপনিষদের সার এবং তত্ত্বের দিক হইতে দুইটি অভিন্ন।

॥ নারী জাগরণ ব্রত ও নিবেদিতা ॥

এই সময়কার সমাজ জীবনে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলনের বিবর্তনের পথে ~~শিক্ষার~~ নিস্কাম কর্মের ব্রত উদযাপন। ১৮৭২ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র সেন অনুষ্ঠিত ভারত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা —এবং এই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালী সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলনও চর্চা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অবশ্য ভারত-আশ্রম সুদীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। দ্বারকানাথ গাংগুলী মহাশয়ের উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে "হিন্দু মহিলা" নামে একটি নূতন ব্রবিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

এই প্রসংগে বাঙালী নারীজাতির উচ্চ শিক্ষায় সাহায্যকল্পে প্রথম যে ইংরেজ মহিলা এদেশে আসিয়া নারীশিক্ষার প্রসারে অগ্রনীভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম স্মরণ করিতে পারি। শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত "রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বংগ সমাজ" গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি :

"কুমারী এএক্রয়েড ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ গার্টন কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তদানীন্তন ইংলণ্ডীয় নারীকুলের মধ্যে সুশিক্ষিতা রমনী ছিলেন। ভারতের নারীগণের শিক্ষার দুরবস্থার কথা শুনিয়া এদেশে আসিয়া নারীকুলের শিক্ষাবিধান বিষয়ে সাহায্য করিবার বাসনা তাঁহার মনে উদিত হয়। তিনি আসিয়া পূর্ব আলাপ সূত্রে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। এবং নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা হইলেন।"[৬৪]

বিদেশে আসিয়া বিদেশিনী নারীগণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারে আত্মনিয়োগ করিবার প্রচেষ্টার পশ্চাতে হয়ত নানাকারণ থাকা সম্ভব - তাহার মধ্যে নিষ্কাম সেবাবৃত্তিও যে অন্যতম কারণ ছিল তাহা বলা নিশ্চয়ই অসংগত নহে। কিন্তু এ সমুন্দে যাঁহার সেবা সংশয়াতীত ভাবে ষোল আনা নিষ্কাম, তাঁহার কথাই মুখ্য আলোচনার বিষয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের ঘটনা। এই সময় একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শুদ্ধার সংগে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, যিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই তিনি হইতেছেন বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা।

নিবেদিতা অবশ্য বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী হিসাবে আমাদের দেশে আসেন নাই, তিনি বাগবাজারে একটি বিশেষ গলির কাছে একাকিনী কবির শিক্ষা-প্রদীপের একটি অনির্বাণ শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া তপস্যায় বসিয়াছিলেন। সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে; শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। তাঁহার সম্পর্কে যথার্থই বলা হইয়াছে যে -

" The writings of the late Sister Nivedita in the awakening of a sense of want for national education among our countrymen and the implanting of civic interests in their hearts have already received xx recognition everywhere as being quite extraordinary and deeply suggestive in their nature." 65.১৫

শিক্ষা সম্পর্কে নিবেদিতা একটি নূতন দর্শন দিয়াছেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার একটি অভিমত তুলিয়া ধরা হইল :

"Education has to deal with various factors, the imparting of special processes, the assimilating of certains kinds and quantities of knowledge, the development of the man himself. Of all these it is the last which is incomparably the most important and in the man it is again his ideals which form the critical element. It is useless to attempt to teach a man anything which he does not desire to learn. It is absurd to try to force on him an advantage which he resists. Education is like mining. It begins with the ideal, it builds first at the top." ৪৫

নিবেদিতা যেন নিষ্কামকর্মতত্ত্বের জীবন্ত প্রতিমা। অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "রবীন্দ্র নাথ ও নিবেদিতা" প্রসংগ আলোচনা করিতে গিয়া নিবেদিতার নিষ্কামকর্মময় জীবনকে প্রতিভাত করিয়াছেন :

"দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর History of Bengali language and literature, পাণ্ডুলিপি নিবেদিতাকে দিয়ে দেখিয়ে এবং সংশোধন করিয়ে নিতেন। প্রায়ই বোসপাড়া লেনের নিবেদিতার বাসায় আসতেন। নিবেদিতা প্রতিদিন সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দীনেশচন্দ্রের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। দীনেশচন্দ্র তাঁর কর্মৈষণার মধ্যে গীতার নিষ্কাম কর্মের জীবন্ত বিগ্রহকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'এরূপ নিঃস্বার্থ আত্মপরবিরহিত প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণ-রূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানিনা। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম –তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণভাবে পাইয়াছিলাম।"[৬৭]

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যে মূর্তিটি যে ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত হইয়াছিল তাহার নাম লোকমাতা –নিবেদিতা। নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবন গীতার আদর্শের অবিকৃত প্রতিফলন। তিনি শুধু নিজে ব্যক্তিগত জীবনে গীতা শিক্ষার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন নাই। সমগ্র জাতির জীবনে শিক্ষার জাগরণ আনিবার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ প্রদর্শিত শিক্ষাদর্শ স্থাপন করিতে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। গীতার আদর্শ ভিত্তিক জীবনগঠন – তাঁহার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি "গীতাপাঠের আসরে সাগ্রহে যোগ দিতেন মেয়েদেরও যোগ দিতে বলতেন।"[৬৮]

কলকাতায় প্লেগের সময় তাঁহার বরাভয় প্রদায়িনী মূর্তি জঘন্য বস্তির নীরন্ধ্র অন্ধকারকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই দেশকে কতটা ভালবাসা যায় নিজেকে কতটা নিঃশেষে নিষ্কামভাবে দান করা যায়, তিনি যেন তাহারই পরীক্ষা

করিয়াছেন। এই আত্মনিবেদন যাহাকে প্রকৃত আত্মবিসর্জন বলা যায় তাহার মহত্তম কল্যাণের দিকটি রবীন্দ্রনাথের অশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষন করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে অনবদ্য ভংগীতে বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ - "প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সেজন্য মানুষ যতপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার মনে ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দেবেন। নিজেকে তাঁহার সংগে x একটুকুও মিশাইবেন না - নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভ লোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছুই না - ভয় নয়, সংকোচ নয়, আরাম নয়, বিশ্রাম নয়।' (পরিচয়)

এই আরাম বিহীন অনলস কর্মসাধনা, যাকে আমরা ফলিত নিস্কামতত্ত্ব নাম দিতে পারি, তার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের জনসাধারণ। এদের সেবা করা, যত্ন করা, চক্ষুস্মান করা এই ছিল নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা।"[৬৮]

প্রসংগত স্মরণযোগ্য যে আমরা বাংলাদেশে তথা ভারতে নারী জাগরণের ইতিহাস আলোচনা করি নাই। সুপ্রাচীনকালে গৌড়ীয় সমাজে ও পরিবারে নারীর স্থান কি ছিল, কি ভাবে নানা-যুগ পরিবর্তনের অভিঘাতে তাহার বিচিত্র রূপান্তর ঘটিল এবং ধীরে ধীরে কিভাবে সমাজের ক্ষেত্রে নারীশক্তি অন্দর মহলের অন্ধকারে নিদ্রিত হইয়া পড়িল তাহার বিবরণ দানের কোন প্রয়াস আমরা করি নাই বা করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি নাই। কারণ প্রথমতঃ তাহা আমাদের প্রস্তাবিত আলোচনা সীমার বহির্ভূত, দ্বিতীয়তঃ খুব সুপরিচিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দ্বারা আলোচনাকে ভারাক্রান্ত করা অযথাযথ হইবে মনে করিনাই। এমন কি উনবিংশ শতকে রাজারামমোহন, বিদ্যাসাগর, হেয়ার, বেথুন প্রমুখ স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তকদিগের প্রয়াস ও স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনের

বিবরণও আমরা সুতন ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে চাহি নাই -নিবন্ধের ভূমিকায় ও উপসংহারে যাহা প্রয়োজন তাহা আলোচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উনবিংশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত -স্ত্রী শিক্ষাদি আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সমকালীন চিন্তানায়করা ছিলেন অগ্রনী। ইংরাজী শিক্ষা সমৃদ্ধ নববংগের নেতৃত্ব সর্বাধিক ভাবেই নারীজাগরণের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া ছিল। নবশক্তিতে উদ্বোধিতা বহু বংগনারী সেবায় -শিক্ষায়-সাহিত্যে সমাজ সংস্কারে সর্বাত্মক উন্নয়ন কর্মের সামিল হইয়াছিল। তাহার মূলে মুখ্যতঃ ছিল ব্রাহ্ম সমাজ ও ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজী সভ্যতার অনুসরণকারী নববংগের নেতৃত্ব পাশ্চাত্য দার্শনিক কোঁৎ, বেন্থাম, মিল প্রভৃতির - হিতবাদ একটা বলিষ্ঠ সামাজিক নীতিবোধের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল নারী জাগরণের কার্যে নানা দিক হইতে। কিন্তু নিষ্কাম সেবা ও কল্যাণ বোধের যে আদর্শ নিষ্ঠা বংকিমচন্দ্র কেশবসেন পরে রবীন্দ্র নাথ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন - তাহা পূর্বকালের নেতৃত্বের আদর্শ ভূমি হইতে সুতন ছিল। এইটি সর্বাপেক্ষা ভাস্বর ও প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছিল লোকমাতা নিবেদিতার মধ্যে তাঁহার ধ্যানে, স্বপ্নে, রচনায়-বক্তৃতায় -অবিচ্ছিন্ন কর্ম-ধারায়, আর নিবেদিতার কর্মধারা -নিষ্কামকর্মের সংগাপ্রবাহের সোমুখ হইল শ্রীমদ্-ভাগবদ গীতা -গীতার নিষ্কামকর্মযোগ। তাই আমরা নিবেদিতার কথাটি মুখ্যতঃ নিবেদন করিলাম।

॥ রাজনৈতিক ও সমাজসেবামূলক ক্রিয়াকলাপ ॥

১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পরঅষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের মধ্যে - ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে সুবে বাংলার রাজশক্তি অধিকার করিয়া লইল। রবীন্দ্র নাথ বলিয়াছেন - 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে'। পাঠান মোগল শাসনের ধারা হইতে ইংরাজ শাসনের ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে প্রথমটির ক্ষেত্রে কেবল প্রশাসনই অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতাটাই ছিল মুখ্য তথা একমাত্র, বর্মায় পাঁড়ন ও হইত কোন কোন স্থানে কিন্তু সামাজিক জীবনের ভিত মোটামুটি অক্ষুন্ন থাকিত। সমাজের স্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক স্থিতি। জমি ব্যবস্থা, পেশানুসারী উৎপাদন, বণিক গোষ্ঠীর ব্যবসায় বাণিজ্য প্রয়াস -প্রমুখ অর্থনৈতিক জীবন পল্লী প্রধান বংগদেশে, তথা ভারতবর্ষে, পুরাতনচালে অনেকটা অক্ষুন্ন ধারায় চলিত। সমাজে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের অধিকার ও প্রতাপ ছিল প্রায় অসপত্ন্য। কিন্তু ইংরাজ আমলে দেশীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ খসিয়া গেল, নূতন সওদাগর শ্রেণীর উদ্ভব হইল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল - ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে সমাজ সংস্কারাদির দিকে প্রবল নজর পড়িল। সামগ্রিক ভাবে সমাজের ভিত নড়িয়া উঠিল।

রাজনৈতিক বিস্ফোরণ হইল ১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়া, যাহাকে আমরা বলি স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রথম গুলিটি ছুঁড়িয়াছিলেন মংগল পাঁড়ে বংগদেশের ব্যারাকপুর সেনানিবাসে কিন্তু বাঙালীরা সিপাহীদের পক্ষে অস্ত্র-

ধারণ করে নাই, সর্বশক্তি দিয়া ইংরাজ শক্তিকে বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু বিদ্রোহাবসানে বাঙালার লেখনীতে যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা অর্জনের আবেগ ক্রমশঃ মুখর হইয়া উঠিল। বিদ্রোহের আগুনকে লক্ষ্য করিয়া উগ্র স্বাধীনতার প্রশস্তি, জাতীয়তার বন্দনা রচনা করিলেন রংগলাল-মধুসূদন-হেমনবীন প্রমুখ কবিগণ; পরে নাটকে উপন্যাসে ও তাহা প্রসারিত হইল।

শুধু সাহিত্য প্রয়াসের মধ্য দিয়া নহে, বা শিক্ষা প্রচারের মধ্য দিয়া নহে, স্বাধীনতার প্রথম সিড়ি হিসাবে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইল, হিন্দু মেলা, জাতীয় রংগালয় স্বদেশী মেলা, বিদেশী, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা আসিল। জমিদাররা, বড়লোকরা একদিন যেমন আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়া সংগ্রাম চালাইতেছিলেন গ্রামে গঞ্জে তেমনি নীলকর চাষীরা, সাঁওতাল কৃষকরা বাহুবল প্রকাশ করিয়া আত্মমর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে উহার একটা পদক্ষেপ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। বিংশ শতকের শুরুতে ১৯০৫ খ্রীঃ প্রথম বংগ ভংগ লইয়া বংগদেশে ব্যাপক ও গভীর আন্দোলন শুরু হইল। প্রকাশ্যে ও গুপ্তপথে বৈপ্লবিক প্রয়াসে দ্বিধাবিভক্ত হইল এই সংগ্রাম। বালেশ্বরে মহানায়ক যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রামের পর এই পর্বের সমাপ্তি হইল। তাহার পর ১৯১৯খ্রীঃ হইল পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। সমগ্র ভারত এই বীভৎসতায় শিহরিয়া উঠিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সংগ্রামের প্রবর্তক নেতা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আগাইয়া আসিলেন। বংগদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইল। তাহার পর নানা বাধা বিপর্যয়, স্তরে স্তরে অহিংসা গণ-আন্দো-

-লন, বিপ্লবীদের মারণ-যজ্ঞের মধ্য দিয়া ধাপে ধাপে আসিল চরম সংগ্রাম।

লক্ষণীয় যে রাজনীতিকে তিনি সরকার দখলের এবং উপর হইতে দেশ শাসন করিবার অর্থাৎ ক্ষমতা বিস্তারের একটি উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন নাই - ইহাকে প্রেমের ও ধর্মের আন্দোলন বলিয়া বলিয়াছেন, জাতীয় জীবনে প্রাণস্পন্দনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাহার পন্থা হিসাবে বলিয়াছেন আত্মনিবেদনের কথা। সর্বভূতে আত্মদর্শন করিয়া শিবজ্ঞানে জীবসেবা, কোন ফলাকাঙ্ক্ষা মনে না রাখিয়া নিরহংকারে সকল কর্তব্য সম্পাদন করা, গভীর প্রেমের সমুন্নবে জীবনকে দেখা - ইহা-ই তো গীতার আদর্শ।

তিনি বলিয়াছেন -

আমার ভরসা তুমি সুখে থাকি দুঃখে থাকি আমার ভরসা তুমি
তোমারে ধরিয়া রব, আর সব ছেড়ে রব আঁখিপর
আলো করে রবে তুমি রবে তুমি তব মুখপানে চেয়ে রব
ওহে এ সংসারে বিপদে সম্পদে তাই আমার ভরসা তুমি। [৭০]

এই একান্ত শরণাগতিই গীতার চরম শিক্ষা। দেশবন্ধু জীবন ও সাহিত্যে একই আদর্শ - ত্যাগের, নিষ্কাম কর্মের, নরনারায়ণ সেবার ও শরণাগতির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিকন্যা অপর্ণাদেবী লিখিয়াছেন -"যে চিন্তাধারা তিনি ছন্দে প্রকাশ করে-ছিলেন, তাই রূপান্তরিত হল তাঁর কাব্যে। 'অন্তর্যামীর অন্তরের বৈরাগ্য পরবর্তী জীবনে তাঁকে দেশের জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়েছিল। কাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরের যে গভীর প্রেমের পরিচয় আমরা পাই নিশ্চয়ই সে গভীর প্রেম-ই তাঁর হৃদয়ে পরাধীনতার

শৃংখল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করবার বাসনা জাগিয়ে দিয়েছিল।"[৭১] দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের অবকাশে, আভ্যন্তরীন 'ভারত ছাড়' আন্দোলনও বাহিরের নেতাজীর আজাদ-হিন্দ ফৌজের আক্রমন -এই দুইটির আঘাতে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি নড়িয়া গেল। অন্যান্য কারণের সহিত মুখ্যতঃ আজাদহিন্দ ফৌজের আবির্ভাবে আর দেশীয় সেনাবাহিনীর আনুগত্য বৃটিশ শাসন শক্তির অন্যতম শরিক বৃটিশ আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া - ভেদনীতির সর্বশেষ সার্থকতা রূপ দেশ বিভাগ সম্পন্ন করিয়া ভারত ত্যাগ করিলেন। এই সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনায় কোনো কালানুএনমিক আলোচনা অনাবশ্যক। স্বদেশী ও বিপ্লবী যুগের কাহিনী ও মূল প্রেরণার কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু আমাদের আলোচ্য সময় সীমার মধ্যে যে রাজ-নৈতিক আন্দোলন তাহার মূল প্রধানতঃ গীতার নিস্কাম কর্মের আদর্শ প্রেরণা কিভাবে কাজ করিয়াছে - তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

এই সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের পুরোভাগে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। মূল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়া - চরমপন্থী -নরমপন্থী বিরোধী শক্তি যুগলের আঘাতে প্রত্যাঘাতে অগ্রসর হইতেছিল। লক্ষণীয় যে অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতই এক-ই কর্ম প্রবাহে দ্বিধা বিভক্ত বিরোধী শক্তির আবির্ভাব হয় এবং তাহার আঘাতে প্রত্যাঘাতে সংঘর্ষের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত নূতন পথের দেখা মেলে। নরমপন্থী চরমপন্থী, দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী, রক্ষণ-শীল, আপোষপন্থী-আপোষ বিরোধী প্রমুখ নানা নামে তাহারা বিভিন্ন কালে অভিহিত হয় এবং কিছুদিন এক একটি বলিষ্ট শ্লোগানে সমাজকে সচকিত করিয়া রাত্রে অন্ধ-কারে হারাইয়া যায়। মধ্যাহ্নের চরমপন্থী, বামপন্থী, প্রগতিশীল, সায়াহ্নের

নরমপন্থী, দক্ষিণপন্থী, রক্ষণশীল ধারাতে পরিণত হইয়া যায়। প্রায় গতিরই তাত্ত্বিক ইতিহাস সূত্র এই এক ধারায় চলে।

যাহাহোউক শতাব্দীর শুরু হইতে যে তীব্র কর্মচাঞ্চল্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিল তাহাতে বাঙালী নেতৃবৃন্দের পুরোভাগে ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অসহযোগ আন্দোলনে তৎকালীন কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম কৃতী ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন -বিপুল উপার্জনের পথ ত্যাগ করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ। সংসার পোষণ ও দেশসেবা এই দুইদিক বাধ্য করিয়া চলিতে পারিলেন না। শুধু আইন জীবিকা নহে, বাড়ী ঘর সম্পত্তি সবকিছু দান করিলেন, বিলাসী জীবন ও আনুষংগিক যাবতীয় অভ্যাস, পেশা -নেশা সব ছাড়িয়া খদ্দর পরিয়া প্রাসাদ হইতে পথে নামিয়া আসিলেন -স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কাহারও জন্য কিছু রাখিয়া আসিলেন না। চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু হইলেন। আমরা তাঁহার মনোভাব কর্মধারা চরিত্র আলোচনা করিয়া প্রেরণার সূত্রটি অনুসন্ধান করিব এবং এই একটি বিশ্লেষণের মধ্যেই সেই যুগের রাজনৈতিক কর্মাদর্শের মূল স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হইবে।

দেশবন্ধু ছিলেন ষোল আনা বৈষ্ণব আচরণেও ধ্যানে। তাঁহার মুখপত্র 'নারায়ণ' কাগজের মধ্য দিয়াও তিনি নিজের আদর্শ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। কবি চিত্তরঞ্জনের অনুর্ধামী সাগর সংগীত প্রমুখ কাব্যে যে ঈশ্বরানুভূতির, যে শরণাগতিতে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তুলনারহিত, কেবল কাব্য মাধুর্যের জন্য নহে - জীবনচর্চায় তাঁহাকে অনুসরণ ও রূপায়ন করিবার জন্য। কবিতার সত্যকে জীবনে আচরণ করা, উপাসনামন্দিরের নিভৃত নির্জনতাকে দেশের পথে -প্রান্তরে জন-

– সংহতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা, নারায়ণকে নরের মধ্যে অর্চনা করা – এই অকপট ভগবদেকমুখিতা ছিল চিত্তরঞ্জনের – রাজনৈতিক ও কবি জীবনের অর্থাৎ সমগ্র যৌবনের মর্মবাণী। কবিতা সমূহ পরে সাহিত্যপর্বে আলোচনা করা হইবে। এইখানে তাঁহার রাজনৈতিক উক্তি দুই একটি মূল্যবান উক্তির উল্লেখ করিয়া এবং তাহার সূত্রসংকেত করিয়া এই প্রসংগের সমাপ্তি টানিব।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে দেশবন্ধুর ভাষণের একটি অংশ — "আজি আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে এইযে আন্দোলন, ইংরাজীতে যাহাকে রাজনীতি বলে ইহা তাহার আন্দোলন নহে। ইহা প্রেমের আন্দোলন, ধর্মের আন্দোলন, আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন। এই আন্দোলন সফল করিবার একমাত্র উপায় আত্মনিবেদন, সকল গ্লানি, সকল আপদ বিপদকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণের অনুরাগে আত্মনিবেদন।"[৭২]

উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে, তথা ভারতবর্ষে, প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন 'ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়'। তখন ইংরাজী শাসনের মধ্য দিয়া নবজাগ্রত বিজ্ঞান শক্তির ধারক পাশ্চাত্য দেশের সংগে যে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল এবং ইহা যে ভারতের ক্ষেত্রে সর্বাংগীন মংগলের নিদান হইবে - অভ্রান্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রামমোহন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি ইংরাজী শিক্ষাকে সমাহ্বান করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানসমাজ সংস্কার, জনগণের মুক্তির যাবতীয় প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইয়ং বেংগলের মানসিকতার সহিত রামমোহনের দৃষ্টিভংগির ও কার্যক্রমের বিপুল পার্থক্য ছিল। ইয়ং বেংগল যা কিছু ভারতীয় ও প্রাচীন সবকিছুকেই কুসংস্কার, কাজেই পরিত্যাজ্য মনে করিয়া কায়মনোবাক্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহাদের আনুকূল্য আসিয়াছিল। কিন্তু [illegible] বৈদান্তিক ও যুক্তিবাদী রামমোহন কেবল সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারাদি বর্জন করিয়া উপনিষদের তত্ত্বকে, ভারতের ব্রহ্মবাদকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সেইজন্য একই সংগে তিনি খৃষ্টান মিশনারী ও তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সংগে সব্যসাচী অর্জুনের মত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মতত্ত্বের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই ছিল ধর্মের দিক হইতে মুখ্যকৃতি আর সামাজিক দিক হইতে ইংরাজী শিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তন ও বিস্তার, সতীদাহ নিবারণাদি ছিল তাঁহার প্রধান কর্ম। এই কার্য করিতে গিয়া তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎস ও অবারিত এবং অঙ্কুরন করিয়াছিলেন।

রামমোহনের এই প্রগতি আন্দোলনের অভিঘাতে কেবল ব্রাহ্ম ধর্মেরই বিস্তৃতি ও প্রচার ঘটিল না – বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়াস নানা তরংগে সর্বভরতে ছড়াইয়া পড়িল –মহারাষ্ট্রের প্রার্থনাসমাজ , পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দের আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারতের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি বহুকর্মে বিকশিত হইয়া উঠিল। অবশ্যই দৃষ্টিভংগী ও কর্মপন্থায় পার্থক্য ছিল –কিন্তু দেশ ও জাতিকে এবং তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র মানব সমাজকে সেবার, মানুষের সর্বাংগীন অভ্যুন্নতি প্রয়াসের প্রেরণা ও আদর্শ মোটামুটি একই ছিল। রামমোহনের ঝোঁক ছিল বেদান্তের বা উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডে ও ব্রহ্মবাদে। স্বামী দয়ানন্দের মুখ্য দিক ছিল বৈদিক কর্ম-কাণ্ড মাধ্যম জীবনচর্চা। রামকৃষ্ণ মিশন ভারতীয় তথা পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম-সাধনার ঐক্যপথে। সমন্বয় পথে একটি সেবা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছিলেন। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ভারতীয় পরাবিদ্যার অনুশীলনকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন । এক ব্রাহ্ম সমাজের তিনটি স্তরে –আদি, নববিধান ও সাধারণ সমাজের –কর্মধারার মধ্যেও মৌলিক স্বাতন্ত্র্য লক্ষনীয়। রামমোহন ধর্মের উপর জোর দিয়াছিলেন, দেবেন্দ্র-নাথ প্রাচীন সমাজধারাকে ভাঙিতে চাহেন নাই এবং ধর্মসাধনার ক্ষেত্রকেই তিনি মুখ্য স্থান দিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র প্রথম খৃস্টান ধর্মের প্রতি ও পরে শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে আসিবার পর কীর্তনে তথা ভক্তিবাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন। অর্থাৎ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মি-কতার দিকটিই মুখ্য বিষয় ছিল। কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া যে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার প্রায় পুরো ঝোঁকটা সমাজ কল্যানমুখী। শিবনাথশাস্ত্রী মহাশয় যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিয়াছিলেন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যগণ যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ৭ টি শর্তের মধ্যে কেবল প্রথমটি –'প্রতিমাপূজা করিব না'

বাদে অন্য ছয়টিই সামাজিক ও রাজনৈতিক যেমন (২) বাক্যে ও কার্যে জাতিভেদ মানিব না। (৩) পরিবার ও সমাজে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিব। (৪) নিজেরা একুশ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না এবং কোনও বালিকাকে তাহার ষোড়শ বৎসরের পূর্বে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না। (৫) যথাসাধ্য স্ত্রীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিব। (৬) নিজেদের এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্য শক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম চর্চা প্রচার করিব এবং নিজেরা অশ্বারোহণ ও বন্দুক চালনা অভ্যাস করিব এবং দেশের মধ্যে যাহাতে এ সকল বিদ্যার বহুল প্রচার হয় তাহার চেষ্টা করিব। (৭) একমাত্র স্বায়ত্ত শাসনই বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করি তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সকলের সুখ চাহিয়া এখন যে বিদেশীয় রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার আইন কানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য দুর্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গভর্ণমেন্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার করিব না।"[৭৩]

একটি সর্বাত্মক সমাজ সংস্কার এ প্রচেষ্টা তখন কি ভাবে শিক্ষিত বাঙালীর মনকে উত্তাল করিয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৯ শকের কার্ত্তিক মাসের একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধে। তাহার কিয়দংশ এই প্রকার : "কে সংসারের কোন দিকে থাকিয়া কোন কার্য সম্পাদন করিয়া যাইবে কেহই অগ্রে বলিয়া তাহার নিয়ম করিতে পারে না। চতুর্দিক হইতে নানা লোকে নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা দ্বারা একই উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়। কেহ রাজনীতির উৎকর্ষ সাধনে কেহ রাজনীতির সংশোধন করেন, কেহ আবার ব্যবহার সংশোধনে অগ্রসর হন, কেহ কৃষিকর্মে, কেহ বাণিজ্যে,

কেহ শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার যে বিষয়ে যতদূর ক্ষমতা তাঁহার দ্বারা সেই বিষয়ের ততদূর উন্নতি সম্পাদিত হয়। এই রূপে নানাবিধ চেষ্টাদ্বারা এক এক সমাজ ও সংস্কৃতি সংশোধিত হইতে থাকে। অতএব হিন্দু সমাজে যাঁহার যে বিষয়ে যতদূর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা অনর্থক আলস্য সলিলে নিক্ষেপ না করিয়া হিন্দু সমাজের মংগল সাধনে নিয়োজিত করুন। কেবল এই মাত্র নিয়ম করা যাইতে পারে যে যাহার যে বিষয়ে সমধিক ক্ষমতা ও অভিরুচি তিনি স্বদেশের সেই বিষয়ের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হউন।"৭৪

এই যে কর্মোদ্দীপনা, - বহুদিনের গতানুগতিকতাকে তামসিকতাকে কাটাইয়া উঠিয়া -নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সমাজকে সেবা করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা- ইহার মূলে শ্রীভগবানের উদাত্ত বাণীর অনুরণন শোনা যায়। রাজা রামমোহনের জ্ঞানৈষণা, বিদ্যাসাগরের কর্মৈষণা ও লোকহিতৈষণা এবং তাঁহাদের অপরাজেয় ইচ্ছা-শক্তি অক্লান্ত-উদ্যম, অটুট অধ্যবসায় -তাহার মূলে কতখানি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও চরিত্রের প্রভাব আর কতখানি ভারতীয় জীবনধারা ও দর্শনের প্রেরণা ইহা লইয়া তর্ক থাকিতে পারে এবং আছেও। সমসাময়িক বাঙালী চরিত্রের গুল্ম-কুঞ্জে - তাঁহারা যেন মহীরুহের সদৃশ আকাশ বিহারী। রামমোহন শাংকর দর্শনের অদ্বৈতব্রহ্মকে গ্রহণ করিলেও মায়া ও মিথ্যা বলিয়া জীবনকে উপেক্ষা করেন নাই। বেদান্তের সংগে তন্ত্রকে সমন্বিত করিয়া লোকহিতের চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ মায়াবাদ ও প্রকৃতি পুরুষের জীবন বিমুখী চিন্তা ও দর্শনকে তিনিও গ্রহণ করেন নাই। উভয়েই গীতার জীবনবাদ সম্মুখে

পরিজ্ঞাত ছিলেন। রামমোহন সতীদাহ নিবারণ ব্যাপারে ও অন্যান্য প্রসংগে বহুবার গীতার কথা বলিয়াছেন -গীতা যে তাঁহার অন্যতম প্রেরণা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পুনরুক্তি হইলেও উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে রামমোহন নিজে গীতার পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ধর্মবিশ্বাস বা আত্ম আধ্যাত্মিক সাধনা সম্বন্ধে মুখর ছিলেন না। ঈশ্বরসম্বন্ধেও তিনি কোন ভাল আলোচনা বা প্রবন্ধ রচনা করেন নাই -কেবলমাত্র বোধোদয় গ্রন্থের পাঁচটি বাক্যে সম্পূর্ণ - "ঈশ্বর"শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ছাড়া। তাহাও প্রথম সংস্করণে ছিল না। পরে নাকি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণে উহা যুক্ত করেন। কিন্তু জীবনে গীতার মূল্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিতেন তাহার প্রমাণ এই যে একবার তিনি তাঁহার স্নেহভাজন অমূল্যচন্দ্র বসুকে বলিয়াছিলেন -"জীবনে গীতার উপদেশ অনুসারেই চলাই শ্রেয়।"[৭৫]

এইভাবে গীতার কল প্রধারা সমাজজীবনের অন্তরে নানা দিক হইতে এবং আধুনিক যুগের উষাকাল হইতে প্রেরণা যোগাইতেছিল -ইহার বিপুল প্রকাশ ও প্রবল উচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামীবিবেকানন্দের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রেরণাটি আসিল সাহিত্যমাধ্যম। কৃষ্ণ চরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, গীতারভাষ্য (অসম্পূর্ণ) এবংঅন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে ইহা -গীতার মতাদর্শ মুখ্য প্রকাশ এবং প্রেরণারূপে দেখা-দিল এবং উত্তরকালে, বিশেষত স্বাধীনতা সংগ্রামে - ইহা কর্মরূপ গ্রহণ করিল। সাহিত্য-পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যায়ে এবং সমাজপর্বে - স্বাধীনতা আন্দোলনের আলোচনাকালে আমরা ইহার আলোচনা করিব।

স্বামীবিবেকানন্দের গীতা-প্রেরণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সমাজপর্বে। স্বামীজী যে বিরাট কর্মযজ্ঞ করিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন ভারতকে কেন্দ্র করিয়া গোটা পৃথিবীতে -তাহার ক্ষেত্র ছিল কর্মে, সমাজসেবায়। কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে মুখ্য আলোচনা

এখানে করাই বিধেয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশাবলী তথা সমগ্র জীবন ছিল গীতার সুরে বাঁধা একখানি বীণার মতো। শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ভক্তিযোগের কথা, আত্ম তত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, অনাসক্তি, প্রকৃতি-পুরুষ, জন্মানুরবাদ, নিষ্কামকর্ম, ধ্যান-যোগ, ব্রহ্ম তত্ত্ব, ভক্তিযোগ, শরণাগতি -সর্বকথা -গীতার মহাসমন্বয়ের কথা -ঠাকুর সহজ সরলভাবে বার বার বলিয়াছেন। অন্যলীলার কয়েক বছরের কিছু কথা সংকলিত হইয়াছে শ্রীম কথিত পাঁচখণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। "গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ" নামে গ্রন্থে দুইখণ্ডে শ্রীহরিপদ চন্দ্র মহাশয় -তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথার স্ফুলিংগ হইতে অগ্নিচয়ন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যে কর্মযজ্ঞে অগ্ন্যাধান করিয়াছিলেন এবং বহু বহু শিখা হোমার্চিমালায় যাহা এখনো উজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান, তাহা মোটামুটি সকলেরই দৃষ্টি গোচর আছে। কাজেই কাজেই আমরা বিস্তৃত আলোচনার পথে না গিয়া প্রাসংগিক কয়েকটি সূত্র সংকেত করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন - "গীতা পড়লে কি হয়? দশবার গীতা গীতা বললে যা হয়। গীতা গীতা বলতে বলতে ত্যাগী হয়ে যায়।"[৭৬] এই ত্যাগ অর্থ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ অর্থাৎ অনাসক্তি অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগ। স্বামীজী নানা লেখায় বক্তৃতায়, ত্যাগের মহিমা, অনাসক্তি ও নিষ্কাম কর্মের কথা বলিয়াছেন। কর্মরহস্য বুঝাইয়া স্বামীজী লিখিয়াছিলেন - "গীতার মূল ভাব এই নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইও না।"[৭৭] পুনশ্চ শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে বলিয়াছেন - "ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নাই। ত্যাগ ছাড়া পরাভক্তি লাভ করা যায় না। ত্যাগ - ত্যাগ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।"[৭৮] গীতাতেও আছে কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োঃ বিদুঃ (গী ১৮/২)।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবকে জগন্মাতা বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কাছে শুদ্ধচরিত্র নিষ্কাম ভক্তরা আসিবেন। বিষয়ী দিগের সংগ তাঁহাকে করিতে হইবে না। ঠাকুর নিজে মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়া ডাকিতেন - "ওরে শুদ্ধ নিষ্কাম ভক্ত কে কোথায় আছিস - আয়।" রামকৃষ্ণ মিশনের কল্পনায়, সংগঠনে ও কর্মে বার বার স্বামীজী ত্যাগী ভক্তদের আহ্বান করিয়াছেন।

বস্তুতঃ স্বামীজীর রচনায় বক্তৃতায়, আলোচনায় পত্রাবলীতে গীতার ভাব ও কথায় - শুধু অজস্র নয় একেবারে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ রাজযোগকে নানাবিষয়ে আলোচনায় গীতার বিভিন্ন অংশ মন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন। একসময় গীতা ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যাও আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই এবং গীতাতত্ত্ব নামে তাহা সংক্ষেপে সংকলিত হইয়াছে। গীতার গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা যাউক -(ক) আমি তোমাদিগকে সেই দিনই বলিয়াছি যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশ সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা - একমাত্র প্রামাণিক টীকা - গীতা চিরকালের মতো রচিত হইয়াছে। ইহার আর কোন টীকা টিপ্পনী চলিতে পারে না। এই গীতায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বেদানু উপদিষ্ট হইয়াছে।"[৭৯] (ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা।)

(খ) "এখানেও আমরা দেখিতে পাই, গীতার মতো বেদের ভাষ্য আর কখনো হয় নাই। হইবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য বুঝা বড় কঠিন কারণ ভাষ্যকারেরা নিজেদের মতানুযায়ী উহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে যিনি স্বয়ং শ্রুতির বক্তা সেই ভগবান নিজে আসিয়া গীতার প্রচারকরূপে শ্রুতির

অর্থ বুঝাইলেন আর আজ ~~ভারতে~~ ভারতে সেই ব্যাখ্যা প্রণালীর যেমন প্রয়োজন - সমগ্র জগতে উহার যেমন প্রয়োজন, আর কিছুরই তেমন নহে।" ৮০ (ভারতীয় মহাপুরুষগণ)

(গ) "এক্ষণে কথা হইতেছে -গীতা জিনিষটিতে আছে কি? উপনিষদ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসংগিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন জংগলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ - তাহার ~~মধ্যেই~~ শিকড় কাঁটা পাতা সব সমেত। আর গীতাটি কি -গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দররূপে সাজানো - যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদের শ্রুদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত আছে এবং এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে .... পূর্ব পূর্ব ধর্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? .... এই সমন্বয় ভাব ও নিস্কাম কর্ম -এই দুইটি গীতার বিশেষত্ব।" ৮১ (গীতাতত্ত্ব)

স্বামীজী লোক কল্যানের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন শিক্ষাবিস্তার, আর্ত্ত উদ্ধার, দীন দরিদ্র পতিতের সেবায় অর্থাৎ সর্বোপরি দেশের সর্বাংগীন উন্নতি সাধনে -তাহার মূল প্রেরণাটি ছিল গীতা, বিশেষতঃ গীতার একটি বাণী -মোহগ্রস্ত অর্জুনের প্রতি প্রথম উদ্দীপ্ত ভগবদবাক্য "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ" -। শোকে গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া রথের উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন যে সব্যসাচী তাঁহার প্রতি বীরবাণী - "ক্লীবতার আশ্রয় নিওনা পার্থ - এই কাপুরুষতা তোমাকে মানায় না, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য

ত্যাগ করিয়া - হে পরন্তপ, তুমি উঠিয়া দাঁড়াও।" কী কারণে এই কথাটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাহা বিশ্লেষণ যোগ্য।

সমকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ও রোগ নির্ণয় করিয়া স্বামীজী 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধে যে ঔষধ বিধান করিয়াছিলেন তাহা এই -"চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্যকারিতা সেই একতা বন্ধন, সেই উন্নতি তৃষ্ণা, চাই সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ সহিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি। আর চাই - আপাদ মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"[৮২] যেসত্ত্বগুণ প্রধান প্রাচীন ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে তমোগুণে ডুবিয়া গেল।[৮৩] কাজেই প্রবল নির্ভীক কর্মোদ্যোম চাই। আর কর্মের জন্য চাই রজোগুণ, গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন -

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সংগ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসংগেন দেহিনম্।। গীতা ১৪/৭

মানুষের মনে আসক্তি, বস্তু বিশেষ চাহিবার জন্য প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া রজোগুণ কর্মমুখর করে মানুষকে। তাই রজোগুণ উদ্বোধন করিতে চাহিয়াছিলেন স্বামীজী। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই চতুর্থ মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার করি - "তুমি সেই আত্মা, তুমি স্বরূপকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী-রোগী শোকগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছ - এতো তোমার সাজে না। তাই ভগবান বলিতেছেন, ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে তাহা এই 'ভয়'। যে কোন কার্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া

দেয় – তাহাই পুণ্য ; আর যাহা তোমার শরীর মনকে দুর্বল করে তাহাই পাপ। এই দুর্বলতা ত্যাগ কর। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ – তুমি বীর তোমার এ ক্লীবতা সাজে না। "তোমরা যদি জগৎকে একথা শুনাইতে পারো – ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে তাহা হইলে তিনদিনের ভিতর এ সকল রোগ শোক, পাপ তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উড়াইয়া দাও। তুমি সর্বশক্তিমান – যাও তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না, তাহার বাহির দিকে দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন সেইদিকে দৃষ্টিপাত কর ; সমগ্র জগৎকে বলো – তোমাতে পাপ নাই তাপ নাই তুমি মহাশক্তির আধার।

"এই শ্লোকটি পড়িলেই সমগ্র গীতা পাঠের ফল পাওয়া যায়। কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।" (গীতাতত্ত্ব)[৮৪]

পুনশ্চ – "যুদ্ধ ক্ষেত্রেই অর্জুনকে গীতা বলেছেন – ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম – যুদ্ধ করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন। এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্মহীন – অস্ত্র ধরিলেন না। যেদিকে চাইবে দেখবি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র

জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিযোগ – তিনি যেন সকলেরই মূর্তিমান বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটি বিশেষ আলোচনা চাই। এখন বৃন্দাবনের বাঁশী বাজানো কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা। ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা – কালী এঁদের পূজা তবে তো লোকে মহাউদ্যমে কর্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে। ·····মহারজোগুণের

উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। ·····তাই বলছি এখনকে মানুষকে রজোগুণে উদ্দীপিত করে কর্মপ্রাণ করতে হবে। কর্ম-কর্ম-কর্ম। এখন নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায় – এছাড়া উদ্ধারের আর অন্য পথ নেই।" (স্বামী-শিষ্য সংবাদ)[৮৫]

পুনশ্চ – "আর ঐ যে মিনমিনে পিন্‌পিনে ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা সাতদিন উপবাসীর মতো পায় আওয়াজ, সাতচড়ে কথা কয়না – ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ। ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন। ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায় ? প্রথম ভগবানের কথা থেকে কি সে কথা বেরুল দেখ – ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। শেষ – তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য)[৮৬]

রামকৃষ্ণ মিশনের বহুমুখী সমাজ কর্মের মধ্যে শিক্ষা ও সেবা এই দুইটি মুখ্য। এই দুইটি বিষয়ে স্বামীজী নানাভাবে নানাক্ষেত্রে বলিয়াছেন বহুবার 'স্বামি শিষ্য সংবাদ' হইতে দুইটি অংশ উদ্ধার করি – "পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যদের কিকি কাজ করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে বিদ্যাদান ও জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন Education Education নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।" (স্বামি শিষ্য সংবাদ)[৮৭]

পুনশ্চ "প্রথমে ছোট scale – এরকটা Relief centre খোল, তাতে গরীব দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে, যাদের দেখবার নেই এমন অসহায় লোকদের জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সেবা করতে হবে বুঝলি ? ·····

জীব সেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবা ধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসার বন্ধন কেটে যায় - মুক্তি কর ফলায়তে। (স্বামি শিষ্য সংবাদ)[৮৮]

উত্তরকালে সমাজসেবামূলক কাজের ধারা মোটামুটি এই খাতে প্রবাহিত - যাহার উৎস মুখে গীতার আদর্শ অকুরনু তুষারের হিমবাহের ধারায় বিগলিত।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই জাতি বর্ণ সমস্যা বংগদেশের ততোধিক সর্ব-ভারতীয় সমস্যা। সাদা-কালো, নিগ্রো-কাফ্রী-ইংরাজ-ফরাসী একটি বিশ্ব সমস্যা। অথচ সর্বদেশে সর্বকালেই বর্ণবৈষম্য ও শ্রেণী বৈষম্য ছিল ও আছে বিভিন্ন নামে। কিন্তু জন্মগতভাবে অস্পৃশ্য হওয়া, ঘৃণাভাজন হওয়া বংশের জন্য-দেহের বর্ণের জন্য-নীচে থাকিতে বাধ্য হওয়া আধুনিক পৃথিবীতে একটি মানবিক অপরাধ, প্রাচীন কালের দিক হইতে বিচার করিলে, ভারতবর্ষে যে বর্ণ বিভাগ ছিল তাহা লইয়াও সমস্যা দেখা দেয়। আধুনিক ভারতের সকল মনীষাই নানাভাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের রচনায়-বাণীতে বারবার শোনা যায় উদাত্ত আহ্বান-

"ভুলিও না -নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর সদর্পে বল - আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল-মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই - " ইত্যাদি। রবীন্দ্র নাথও বলিয়াছেন - "মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে / সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান / অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

এই জাতীয় মহান অসংখ্য কথা আছে স্বামীবিবেকানন্দের ও রবীন্দ্র নাথের রচনায়।

মহাত্মা গান্ধী আমরণ অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে গীতার মত ও তাহার সামাজিক রূপটি আলোচ্য।

'চাতুর্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুনকর্ম বিভাগশঃ।' গীতার এই ৪র্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ মন্ত্রের এই প্রথম রচনাটি শ্রীভগবানের উক্তি। গুন ও কর্ম বিভাগ করিয়া তিনি চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতীয় সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - এই বর্ণ বিন্যাস কিন্তু জন্মগত শ্রেণী বিন্যাস ছিল না। গুণানুসারী কর্মের যে ব্যবস্থা তাহাই বর্ণ। ক্রমে তাহা কালের গতিতে অপকর্ষ লাভ করিয়া জন্মানুযায়ী হইয়াছে। উত্তরকালে বংগদেশে সেন আমলে বল্লালী কৌলীন্য আদর্শের যে অধোগতি পরবর্তী হাজার বছরে বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজে দুরারোগ্য ব্যাধি মহামারী সৃষ্টি করিয়াছিল - অনতিদূর ইতিহাসের ঘটনা হিসাবে - ইহার সংগে তুলনীয়। এই বিষয়ে অধ্যাপক শ্রী ত্রিপুরা - শংকর শাস্ত্রী মহাশয়ের মূল্যবান মন্তব্যটি উদ্ধার করি - "মানুষের ভেতরে যে প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য আছে এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না। আর এই প্রকৃতিভেদ স্বীকার করে নিলে কর্মের ভেদ, বৃত্তির ভেদ এবং অধিকার ভেদ -কেও স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু একথাও সত্য যে প্রত্যেকটি মানুষ স্ব স্ব প্রকৃতির অনুসরণ করেই ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারে। আর্য ঋষিগণ যে দ্বিজাতির জন্য চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাও উদ্দেশ্য ছিল জীবনে পরিপূর্ণতাকে লাভ করা অথবা আমাদের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে ধীরে ধীরে প্রকটিত করা। শ্রীভগবান অবশ্য গীতায় এই আশ্রম চতুষ্টয়ের কথা বলেন নি। তন্ত্র শাস্ত্রেও বলা হয়েছে এরূপ যুক্তির কথা। তন্ত্র বলেন, আমাদের মধ্যে যেমন অধিকারের ভেদ আছে, তেমনি আচারের ভেদও

আছে। সংসারে কেউ তামস প্রকৃতি, কেউ রাজস প্রকৃতি, কেউ বা সাত্ত্বিক প্রকৃতি। তাই আচারও তিন রকমের -পশ্বাচার, বীরাচার, দিব্যাচার। অবশ্য দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মুক্তিলাভ করাই মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য। ভারতীয় জীবন দর্শনের মূল ভিত্তিও তাই। আমাদের আদর্শ অবশ্য খুব বড়। স্থিত প্রজ্ঞ বা স্থিতধী হওয়া, যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা। তপস্যা বা সাধনার দ্বারাই মানুষকে গুণ অর্জন করতে হয়। তপস্যার প্রভাবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারে, আবার তপস্যার অভাবে ব্রাহ্মণও শূদ্র হতে পারে। গীতায় ভগবান নৈমিত্তিক চাতুর্বর্ণের কথাই বলেছেন, বংশগত চাতুর্বর্ণের কথা বলে নি।"[৮৯]

পুনশ্চ :- "অবশ্য জাতিভেদ প্রথা যখন সম্পূর্ণ বংশগত হয়ে দাঁড়াল মানুষে মানুষে যখন কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হ'ল তখন এটাই হয়ে দাঁড়াল একটা মস্ত-বড় অভিশাপ। কিন্তু একথাও সত্য যে চাতুর্বর্ণ্য ও চতুরাশ্রমের ভেতরেই রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্টতা।"[৯০]

গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের চাতুর্বর্ণ্যং মন ত্রুটি অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৪১ নং মন ত্রুটির সংগে মিশাইয়া পাঠ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈ গুণৈঃ ।। ১৮/৪১

অর্থাৎ প্রকৃতিজাত ত্রিগুণানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও কর্মসমূহ পৃথক রূপে বিভক্ত। স্বভাবগুণভেদ হইতে যে বর্ণভেদ গীতাতে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা উত্তরকালে জন্মগত বংশ ধারায় বিকৃত হইয়াছিল এবং স্থায়ী জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল। পিতার বৃত্তি এবং জীবিকা পুত্রও গ্রহণ করুক - এই স্বাভাবিক মানসিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ হইতেই ইহার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। সাম্প্রতিককালেও বৃত্তির নির্বাচন

ব্যাপারে ইহার প্রভাব কম নহে। এই বিষয়ে শ্রী অরবিন্দের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য – "প্রথমে সমাজ ব্যবস্থায় জন্মকে বেশি বা কিছুই প্রাধান্য দেওয়া হইত না বলিয়া মনে হয়, গুণ ও সামর্থ্যেরই প্রাধান্য ছিল, কিন্তু পরে যখন বর্ণের আদর্শ সুনির্দ্ধারিত হইল তখন শিক্ষা ও ঐতিহ্যের দ্বারা তাহাকে রচনা করা আবশ্যক হইল এবং শিক্ষাও ঐতিহ্য স্বভাবতই বংশ পরম্পরার ধারায় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। এইভাবে ব্রাহ্মণের ছেলে লোকাচার অনুসারে সর্বদা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল, আর বংশানুক্রমিক প্রথার সহিত জন্ম ও বৃত্তির মিল হইলে কথাই ছিল না, বংশানুক্রম প্রথাও ক্রমশঃ বেশি বেশি বাঁধা বাঁধি হইয়া উঠিল। (সমাজ বিকাশের মনস্তত্ত্ব – শ্রীঅরবিন্দ)[৯১]

রক্ষণশীল দলের ব্যাখ্যা একটু অন্য ধরণের। জীবের জন্ম গুণ ও কর্মানুসারে হয় এবং জন্মের মধ্য দিয়াই স্বভাব ধর্ম প্রাপ্ত হয়। ব্যাখ্যাকার রামদয়াল মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন – প্রাচীন সংস্কার বশতঃ মানুষ এক একটি মুখ্য অভ্যাস লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যাহার যে অভ্যাস বা সংস্কার জন্ম সে সেই ভাব লইয়াই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এ জন্য বর্ণানুগ ধর্ম স্বাভাবিক।"[৯২]

আবার বর্ণানুযায়ী স্বাভাবিক মানসিকতার অনুবর্ত্তন করিয়া ব্যাখ্যা আছে। বংকিমচন্দ্র বলিয়াছেন –"সমাজ মাত্রেই কর্মানুসারে তিন শ্রেণী বিভাগ আছে। যাঁহারা ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা করেন এবং লোক শিক্ষা দেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দেশ রক্ষা করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাহারা কৃষি শিল্প বাণিজ্য দ্বারা দেশের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করেন তাঁহারাই বৈশ্য এবং এই তিন শ্রেণীর সাহায্যার্থে যাঁহারা পরিচর্য্যাত্মক কাজ করেন তাঁহারা শূদ্র।"[৯৩]

এই বিষয়ে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য -'যেখানে মানবসমাজ আছে সেখানেই চারিবর্ণের ভেদ আছে। ঐ ভেদানুসারে সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিলে কল্যান হইবে। বিশৃঙ্খলা থাকিলে অকল্যান হইবে। উহা মনুর কথা। বর্ত্ত-মান কালেও সমাজে কতগুলি লোক আছেন, যাঁহারা সমাজের বিধি বা আইন প্রণয়ন করেন (লেজিসলিটিব), তাঁহারা ব্রাহ্মণ স্থানীয়। যদি তাঁহারা সকলে ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হন, তাহা হইলে সমাজ উন্নতির পথে চলিবেই। অন্যথায় কুফল ফলিবে। যাঁহারা সমাজের কার্যকরী শক্তি শাসন শক্তি (একজিকিউটিভ বা এডমিনিস্ট্রেটিভ), তাঁহারা যদি ক্ষত্রিয় গুণোপেত হন তাহা হইলে ঐ কর্ম সুষ্ঠু হইবে। অন্যথায় শুভ হইবে না।"[৯৪] অর্থাৎ তদুচিত গুণ না থাকিলে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে গেলে - অকাজ হইবে। অপকর্ম হইবে, অকল্যান হইবে। গুণগত অধিকারই স্বধর্ম।

পনশ্চ : "এই বর্ণভেদ গুণানুযায়ী। কেহ কেহ মনে করেন জন্মগত জাতিভেদের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। কে কোন বর্ণের তাহা কর্ম প্রবণতা দেখিয়া কতকটা বুঝা যাইবে।

"বর্ত্তমান সময়ের সমাজ অতীব জটিল হইলেও সমস্ত কর্মগুলি এখনও চারিভাগে ভাগে ভাগ করা চলে। কতকগুলি কর্ম শুদ্ধ আধ্যাত্মিক (Spritual.) কতকগুলি রাজনৈতিক (Political), কতকগুলি কর্ম অর্থনৈতিক(Economic.) কতকগুলি কর্ম সেবাত্মক (Labour)। যে নিজ জীবনে স্বভাবজ কর্ম খুঁজিয়া পাইয়াছে ও তাহা করিতেছে সে অনেকটা শান্ত। যে পায় নাই তার নিয়ত কর্ম(call in) সে সর্বদাই অসামঞ্জস্যের উদ্বেগ বোধ করে।"[৯৫] ইহা হইতেছে কর্মসংতৃপ্তি বা Job satisfact;

এর কথা – নিজের স্বভাবানুকূল কর্মের মাধ্যমে স্বাভাবিক আনন্দ থাকে তাহার কথা সাম্প্রতিক কালে কি আইন সভাতে, কি প্রশাসনে কি বিভিন্ন বৃত্তিতে কর্মরত বিভিন্ন [illegible] মানুষের মধ্যে যে অসারতা, ব্যর্থতা, হতাশা লক্ষিত হয় তাহা স্বধর্মচ্যুতির জন্য অনধি-কারীর কর্ম ও বৃত্তি গ্রহণ করিবার জন্য কিনা ও কতটা তাহা চিন্তনীয়।

যাহা হউক অস্পৃশ্যতা তথা জাতিভেদের বিরুদ্ধে এবং জনসেবার পক্ষে যে আন্দোলন আন্দোলন এই শতকে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে মানুষ মাত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব উজ্জীবিত হইয়াছে তাহার মূলে গীতার প্রভাব একই মানুষের গুণানুসারে কর্ম বিভাগ বা স্বধর্মানুসারে কর্মের ধারণা কতখানি তাহারই আলোচনা প্রসংগে নানা ব্যাখ্যা ভাষ্যর কথা বিচার করা হইল।

ঋগ্বেদে যে বিরাট পুরুষের কথা আছে, যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও চরণ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি –তাহার পরিচয় গীতা অন্যভাবে দিয়াছেন। বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে অর্জুনের চোখে লোকক্ষয়কৃৎ মহাকালের মূর্তিটি মুখ্যতঃ প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু গীতার মধ্যে নানা স্থানে বিশ্ব সৃষ্টির মূলে যে তিনি বার বার বলিয়াছেন –

এতদযোনীনি ভূতানি সর্বাণ্যুপধারয় ।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।। গীতা

ইত্যাদি মন্ত্রের মধ্যে যে সর্বাত্মক পরিচয় তাহার প্রতিটি অংশই ব্রহ্মস্বরূপ, ছোট বড় ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদ কোথায়? যত্র জীব তত্র শিব বা নর নারায়ণ স্বরূপটি এই ক্ষেত্রে যেন নূতন করিয়া গুরুত্ব লাভ করিয়াছে তাহা জীবে দয়া নহে –জীবপ্রেম বা জীব সেবা।

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়

মন প্রাণ শরীর অর্পন কর সখে এ সবার পায়ে ।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,

মন্তু — বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।[৯৬]

এই জীবপ্রেম প্রবাহের প্রত্যক্ষ উৎস হইল যে গীতা তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসংগে সন্ত বিনোবা ভাবেজীর একটি মন্তব্য উদ্ধার করিয়া বিষয়ের ইতি টানা যাউক।

"আমাদের জন্মের পূর্বেও জগৎ ছিল আমাদের মৃত্যুর পরেও থাকিবে। আমাদের পূর্বেও অনন্ত প্রবাহ ছিল আর সামনেও তাহা আছে। এইরূপ প্রবাহে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি যে বাবা মায়ের ঘরে আমাদের জন্ম তাহাদের সেবা করা , যে প্রতিবাসীর মধ্যে জন্মিয়াছি তাঁহাদের সেবা করা। এই কর্ত্তব্য তো আমরা প্রাকৃতিক নিয়মেই পাইয়াছি? তাহা ছাড়া আমাদের বৃত্তি সমূহ ও আমাদের প্রতিদিনেরই অভিজ্ঞতার ফল? আমার ক্ষুধা লাগে তৃষ্ণা পায় সুতরাং ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া ও তৃষ্ণার্তকে জলদান করা আমার প্রবাহ প্রাপ্ত ধর্ম। সেই জন্য সেবারূপ ওভূতদয়ারূপ স্বধর্ম করিয়া x খুঁজিয়া লইতে হয় না।[৯৭]

তথ্যপঞ্জী

১) নীহার রঞ্জন রায় — বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) পৃঃ ৮৩৩

২) বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ

৩) তদেব — তদেব — ৭ম পরিচ্ছেদ

৪) নরানাঞ্চ নরাধিপম্ — গীতা — ১০/২৭

৫) যদ্ যদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ

গীতা — ৩/২১

৬) রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাঙলার ইতিহাস — পৃঃ ১৯০

৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — সাহিত্য সাধক চরিতমালা

৫ম সংস্করণ — পৃঃ ৯৬-৯৭

৮) রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর — জীবনস্মৃতি (১৯৬২) — পৃঃ ৪৮

৯) দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর — গীতাপাঠ (১৩২২) — পৃঃ ১

১০) হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ — বংকিম চন্দ্র — পৃঃ ঘ

১১) তদেব — তদেব — পৃঃ ৮৩

১২) বংকিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ধর্মতত্ত্ব

১৩) রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাঙলাদেশের ইতিহাস

(আধুনিক যুগ) — পৃঃ ২০২

১৪) বংকিমচন্দ্র — আনন্দমঠ ২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ

১৫) তদেব — তদেব

১৬) জ্ঞেয় স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতে

গীতা — ৫/৩

১৭) স্বামী বিবেকানন্দ বীরবাণী

১৮) ভবতোষ দত্ত চিন্ময়নায়ক বিবেকানন্দ পৃঃ ২৮

১৯) অবশ্য তখনো তিনি শ্রীঅরবিন্দ নামে পরিচিত ছিলেন না। আমরা সর্বত্রই কিন্তু অরবিন্দ বা অরবিন্দ ঘোষ না লিখিয়া শ্রীঅরবিন্দ লিখিলাম।

২০) শ্রীঅজিত রায়চৌধুরী শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি পৃঃ ১৮-১৯

২১) শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ পৃঃ ৫৮
(বংগানুবাদ)

২২) অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ-বিশ পৃঃ ১৬৩

২৩) শ্রী—ম শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪/২১ ও ৫/২২

২৪) শ্রীহরিশ চন্দ্র সিংহ গীতাতত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ পৃঃ ১০২

২৫) তদেব তদেব পৃঃ ১০৫

২৬) " " "

২৭) " "

২৮) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ১৮/৫৫

২৯) শ্রীহরিশ চন্দ্র সিংহ গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পৃঃ৩৭৬

৩০) গীতা ৪/৩৩

৩১) শ্রীহরিশ চন্দ্র সিংহ গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পৃঃ ৩৮০

৩২) স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসংগ

৩৩) Swami Vivekananda. Thoughts on The Gita. Page. 8

৩৪) রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাঙলাদেশের ইতিহাস — পৃঃ ২০২

৩৫) তদেব — তদেব — পৃঃ ২০২

৩৬) স্বামী সারদানন্দ — শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসংগ — পৃঃ ২২৩

৩৭) রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাঙলার ইতিহাস — পৃঃ ২১০

৩৮) স্বামী বিবেকানন্দ — বীরবাণী

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাবলী, অষ্টম সংস্করণ.

৩৯)

৪০) Swami Vivekananda. Thoughts on the Gita.

৪১) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাবলী, অষ্টম সংস্করণ.

৪২) ৫ম খণ্ড.

৪৩) শ্রীমদ্ ভাগবত — ৭/১৪/৮

৪৪) শ্রীমদ্ ভাগবদ্ গীতা — ৩/১২

৪৫) Swami Vivekananda. Thoughts on the Gita. Page. 9.

৪৬) শ্রীমদ্ ভাগবদ্ গীতা — (৬ষ্ঠ খণ্ড) ১২/৪

৪৭) স্বামী বিবেকানন্দ — বর্ত্তমান ভারত — পৃঃ ২৪৯
(বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড)
[illegible]

৪৮) শ্রীমদ্ ভাগবদ্ গীতা — ২/৩

~~৪৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ইতিহাস (বংগদর্শন, ভাদ্র, ১৩০৯)~~

~~৫০) তদেব — [illegible] ধর্ম~~

~~৫১) " — শিক্ষা (১৩৪২) — পৃঃ ৯৫-৯৬~~

৪৯) রবীন দ্র নাথ ঠাকুর — ইতিহাস, বংগদর্শন, ভাদ্র, ১৩০৯

৫০) রবীন দ্র নাথ ঠাকুর — ধর্ম — পৃঃ ১২৯

৫১) রবীন দ্র নাথ ঠাকুর — শিক্ষা সংস্করণ (১৩৪২) — পৃঃ ৯৫-৯৬

৫২) ভূজংগ ভূষণ ভট্টাচার্য — রবীন দ্র শিক্ষাদর্শন — পৃঃ ৪২

৫৩) ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী — গীতাধ্যান — পৃঃ ২৮-২৯

৫৪) " — "

৫৫) " — " — পৃঃ ৮০

৫৬) রবীন দ্র নাথ ঠাকুর — ধর্ম — পৃঃ ২২

৫৭) " — শিক্ষা — পৃঃ ১৭১

৫৮) " — তদেব — পৃঃ ৪৬

৫৯) রবীন দ্র নাথ ঠাকুর — শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম — পৃঃ ৩৬

৬০) " — তদেব — পৃঃ ১১

৬১) ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী — গীতাধ্যান (১ম খণ্ড) — পৃঃ ৭

৬২) রবীন দ্র নাথ ঠাকুর — শিক্ষা — পৃঃ ২৪৬

৬৩) " — " — পৃঃ ৬৩

৬৪) শ্রী শিবনাথ শাস্ত্রী — রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বংগ সমাজ — পৃঃ ৩০৪

৬৫) Sister Nivedita. — Hints on National Education in India. (Forward).

৬৬) Sister Nivedita. — Ibid. — Page. 34-35

৬৭) ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ বিশ পৃঃ ২০০

৬৮) " " পৃঃ ২০৪

৬৯) " " পৃঃ ২৪৬

৭০) কবি চিত্ত গীতাবলী চিত্তরঞ্জনদাশ

৭১) তদেব.

৭২) দেশের কথা – সত্যাগ্রহ দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী পৃঃ ১৩০

~~৭৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিহাস, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩০৯~~

।। ~~পাদটীকা~~ ।।

৭৩) শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্ম জীবনী।

৭৪) বাঙলার ইতিহাস – ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার পৃঃ ৬২

৭৫) বিদ্যাসাগর চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ৫৬৫-৫৬৯

৭৬) শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩/২৯ ৩/২৬০

৭৭) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
(শতবর্ষ সংস্করণ, ১৩৬৯, ১ম খণ্ড) পৃঃ ৪৫

৭৮) তদেব (স্বামী শিষ্য সংবাদ)

৭৯) স্বামীজীর বাণী ও রচনা
(শতবর্ষ স্মরণে, ১ম সংস্করণ, ৫ম খণ্ড) পৃঃ ১৩৭

৮০) তদেব তদেব পৃঃ ১৫৫

৮১) তদেব ~~তদেব~~ তদেব পৃঃ২৫১/২৫২

৮২) স্বামীজীর বাণী ও রচনা
(জন্ম শতবর্ষ স্মরণে, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং পৃঃ ৩২

৮৩) তদেব তদেব পৃঃ ৩৩

৮৬) তদেব (৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ পৃঃ১৫৫

৮৭) তদেব (নবম খণ্ড, ১ম সংস্করণ) পৃষ্ঠা ৩৮

৮৪) স্বামীজীর বাণী ও রচনা

(৫ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ) পৃ: ২৫৩

৮৫) তদেব তদেব পৃ: ১৬/১৭

৮৮) তদেব তদেব পৃ: ৪৬

৮৯) গীতায় সমাজ দর্শন শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী

(১ম প্রকাশ) পৃ: ৩৩

৯১) শ্রী অরবিন্দের গীতা - শ্রী অনিল বরণ রায়

৪র্থ খণ্ড ২২৯

৯২) জগদীশ চন্দ্র ঘোষের গীতা

(১৫ সংস্করণ) পৃ:১২১

৯৩) তদেব তদেব পৃ: ১২১

৯৪) গীতাধ্যান - মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ২য় খণ্ড
৪র্থ সংস্করণ পৃ: ৪৫/৪৬

৯৫) তদেব ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ: ৩৮

৯৬) সবার প্রতি - স্বামীজীর বাণী ও রচনা(৬ষ্ঠ খণ্ড) পৃ: ২৬৯

৯৭) গীতা প্রবচন - বিনবা ভাবে (৭ম সংস্করণ) পৃ: ২৫০